ফেরারী নারী

[বাংলা– Bengali – بنغالي]

আবু বকর সিরাজী

সম্পাদনা : আলী হাসান তৈয়ব

2014-1435

IslamHouse.com

« باللغة البنغالية »

أبو بكر سراجي

مراجعة: علي حسن طيب

2014 - 1435

IslamHouse.com

ফেরারী নারী

লেখকের ভূমিকা

নারী জাতি হিরন্ময়ী। বিপ্লবী অগ্রযাত্রার দুর্দমনীয় সহযাত্রী। পুরুষের অলঙ্কার, দুঃসময়ের প্রশান্তিদায়ী, দুর্যোগের অনুপ্রেরণা, সমাজসভ্যতার ধারা অক্ষুণ্ন রক্ষাকারী কন্যা, জায়া জননী ও মা। পুরুষের অগ্রযাত্রা বেগবান ও স্বতঃস্ফূর্ততা রক্ষার অক্লান্ত রণসঙ্গী। নারী এক চেতনা, কর্মস্পৃহা রচনায় শাণিত অনুপ্রেরণা। ভোগের পণ্য নয়; সৃষ্টির অপার মহিমা। স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসা এবং উন্নত সভ্যতার সূতিকাগার। নারী কেবলই জননী কিংবা ধাত্রী নন, গতিময় অভিসারী সমাজের সহযাত্রী। নারী আছে কাব্য-কবিতায়, সমাজ বিনির্মাণের সৃষ্টিশীল গল্পে- স্বমহিমায়। যুগ পরম্পরায় তাদের কীর্তির সরব উপস্থিতি কর্মোদ্দীপনার সুরে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। নারী শুধু রমণীই নয়, ইতিহাসের জননী। ইতিহাসের হাজারও রওনকে নারীর আছে নিদাগসম প্রখরতা, অগ্নিঝরা বিদ্রোহী কাব্যে গতির ঊর্মিমালা। নারী উপমা-উৎপ্রেক্ষার স্তম্ভ, অনুজ প্রজন্মের আলোকচ্ছটার প্রতিবিম্ব। নারী দুর্গম গিরিখাদে পুরুষের উদ্দীপনা, দরিদ্রক্লিষ্ট গৃহকর্তার সান্ত্বনার আসমানসম শামিয়ানা।

আবৃত নারী সম্ভ্রমপ্রাচীর, যার আড়ালে রক্ষিত হয় নারীসত্তার সতীত্ব। হাওয়া, সারা, হাজেরা, রহিমা, আছিয়া, মারয়াম, খাদিজা, আয়েশা, আছমা, ফাতেমা, হাফসা, উম্মে সালমা, যয়নব, উম্মে কুলসুম,

রোকাইয়া, উম্মে হানী সভ্যতার একেকটি স্তম্ভ, পরিশীলিত জীবনের জীবন্ত সুরাইয়াসম উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এঁরা যুগের সেরা উপহার। রত্নগর্ভা, রত্নপ্রসবিত এবং রত্নবিস্তারিণী। জগতে যত মনীষী এসেছেন তারা সকলেই মায়ের পেট চিড়েই এসেছেন। মায়েদের অকৃপণ স্নেহ-প্রীতি, স্তন্যদান এবং অকৃত্রিম মায়া-মমতার বদৌলতেই একজন সন্তান পরবর্তীতে দেশ ও মানবতার জন্য নিবেদিত হতে পেরেছেন। সুতরাং সমাজ-সভ্যতার ভীত নির্মাণের জন্য ওই ব্যক্তিকে যতটুকু না মর্যাদা দেব, তারচেয়ে বেশি মর্যাদা দেব ওই নারীকে, যার গর্ভে তার আগমন ঘটেছে, বুকের দুধে প্রতিভা সৃষ্টি হয়েছে এবং অকৃত্রিম আদর-স্নেহে বেড়ে ওঠা হয়েছে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী নারী আবৃতবসনেও যে দীপ্তিময় ও প্রখর, তা উলঙ্গ সূর্যের দীপ্তি কিংবা বিবস্ত্র পূর্ণিমার উজ্জ্বলতাকেও ম্লান করে দেয়। মহীয়সী যেবুন্নেছা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তখন ইরান এবং হিন্দুস্তান ছিল ফার্সি সাহিত্যের উর্বরভূমি। হিন্দুদের ভাষায় তীর্থস্থান। কত কাব্যপ্রতিভা যে এই দুই নগরী থেকে জন্ম নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একবার সব প্রতিভা যেন থমকে গেল। কবিতার একটি অংশ নির্মাণে সকল কথাশিল্প ব্যর্থ হল। ইরানের সেরা কবিরা কবিতার এক চরণ লিখে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরের চরণ রচনা করতে ব্যর্থ হলেন। ঘষামাজার মধ্যে কেটে গেল বেশ কিছুদিন। কিন্তু কিছু থেকেই কিছু হয় না। সন্তোষজনক দ্বিতীয় চরণ রচনা করতে কেউ সক্ষম হন না। শেষ পর্যন্ত ওই চরণ লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হলো

হিন্দুস্তানে। দিল্লির প্রতিথযশা কবিগণ থমকে গেলেন। দ্বিতীয় চরণ রচনা করবেন কি, প্রথম চরণের মন্ত্রমুগ্ধতাই তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখল। তাদের সুতীক্ষ্ণ কলমের ডগায় যেন মরিচা ধরেছে! গোটা ইরান ও দিল্লির বিশ্বসেরা কবিগণ ব্যর্থ হলেন। কবিদের কাব্যিক নান্দিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে লাগল। তাদের সে কী শরম! উভয় দেশের কবিদের তখন রক্ষা করতে এলেন এক 'বন্দি' 'আবদ্ধ', 'পশ্চাদপদ' নারী! বাদশাহ আলমগীরের কন্যা হাফেজা আলেমা মহীয়সী যেবুন্নেছা কবিতার প্রথম চরণ চেয়ে পাঠালেন। তাতে এক নজর পড়তেই তার কাব্যসত্তা প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। তিনি খাতা-কলম হাতে নিয়ে দ্বিতীয় চরণ লিখে ফেললেন। কয়েকবার তা ঘষামাজা করে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লির রাজদরবারে। যেবুন্নেছার লেখা কবিতার দ্বিতীয় চরণ গোটা দিল্লিকে স্তম্ভিত করে দিলো। প্রথম চরণের সঙ্গে এত সাদৃশ্যপূর্ণ দ্বিতীয় চরণ দেখে দেশের বাঘা বাঘা কবিরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই বুঝি আবরণের প্রভাব! বন্দিত্বের অবারিত প্রতিভা!

দ্বিতীয় চরণ ইরানে পাঠানো হলে তারা ততোধিক বিস্মিত হলেন এবং কবির নারীত্বের পরিচয় তাদেরকে আরো উদগ্রীব করে তুলল। তারা লিখলেন, হে জ্যোৎস্নামুখী! আপনি আমাদেরকে দিদার দিন! আপনার পূর্ণিমার উজ্জ্বলসম কবিতা আমাদেরকে বিমোহিত করেছে।

জবাবে ওই আব্রু-আবৃত নারী লিখলেন, 'আমি লুকিয়ে আছি আমার কাব্য প্রতিভায়। যে আমাকে দেখতে চায় সে যেন আমাকে দেখে আমারই কবিতায়।' এভাবেই কাব্যখ্যাতি পান যেবুন্নেছা। তার রচিত

‘জেব-ই-মুনশোয়াতে’ আছে সত্যিকার কাব্যপ্রতিভার চিহ্ন। বিখাত ফার্সি কাব্যগ্রন্থ ‘দিওয়ানে মখফির’ রচয়িত্রীরূপেও আছে এই মহীয়সী নারীর নাম। কিন্তু সবকিছুই হতো পর্দার পবিত্রতা ও শুদ্ধতার আঙিনায়।

তাই তো বলি, আবৃত নারী উজ্জ্বল পূর্ণিমার চেয়েও দীপ্তিময়! যুগে যুগে এই আবৃত নারীরাই কীর্তি স্থাপন করেছেন, পর্দার আড়ালে থেকেই রচনা করেছেন সভ্যতার সুদর্শন মিনার। পক্ষান্তরে অনাবৃত নারী গড়েনি ভালো কিছু। বরং খুলে ফেলেছে সভ্যতার একেকটি ইট। তারা হয়েছে ভোগের পাত্র, পুরুষকে করেছে কামুক এবং চরিত্রহীন। বস্তুত পর্দার নারীই ফুলেল নারীসত্তা।

আর এই ফুলেল নারীসত্তা কিছু কীট ও গোবরের পোকা কলঙ্কিত করতে চায়। তারা কারা? যারা নারীর নিয়ন্ত্রিত ও শালীন জীবনাচারের বিরোধী তারাই সেই নর্দমার কীট, গোবরের পোকা! নারীদের সচেতন করা এবং এই গোবরে পোকাদের বিরুদ্ধেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস- ফেরারী নারী!

গ্রন্থটি প্রকাশে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করেছেন মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মুফতি মাকসুদুর রহমান, মোস্তফা কামাল এবং আমার সহধর্মিনী আছমা উম্মে আনাছ। তাদের সকলের জন্য থাকল বিশেষ কল্যাণ কামনা।

আবু বকর সিরাজী

সম্পাদক : দ্বি-মাসিক জীবনপাথেয়

ফোন : ০১৯১৩৭৭৪৪২৯, ০১৭৩৬৬১৬৫৯০

jibonpatheo@gmail.com

বিষয়সূচি

সব নারীসত্তায় বিকশিত হোক এই শুদ্ধতা

'হাঁটু জলে নেমে কন্যা হাঁটু মাছন করে, তাই না দেখে সেই কন্যার প্রেমে গেছি পড়ে, ভালোবাসবে সে কি আমারে' ওয়াসিমের এমন গান যখন বাজছিল, সিনেমায় শাবানা তখন হাঁটুর পর কাপড় তুলে হাটু মাছন করছিলেন। পুরনো দিনে অনেক ভালো সিনেমার পাশাপাশি শাবানা এমন অনেক ছবিতেই অভিনয় করেছেন। কিন্তু আজ এগুলো দেখে শাবানা নিজে নিজে যারপর নাই বিব্রত হন।

এমনিতেই শাবানা কোনো অশ্লীল ছবি বা দৃশ্যে অভিনয় করেননি। তার অভিনীত ছবিগুলো ছিল তুলনামূলক অশ্লীলতামুক্ত। তারপরও নিজের ছবি ও চরিত্র সম্পর্কে শাবানার এই উপলব্ধি প্রমাণ করে তার বদলে যাওয়ার মাত্রা। শাবানার এই বক্তব্য এরই মধ্যে ঢালিউড ও তার এককালীন সহ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাঝে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। যারা সৎ ও নারীজীবনের শুদ্ধতার পথে চলতে চান এবং চলা পছন্দ করেন তাদের জন্যও আশার বাণী হয়ে দেখা দিয়েছে শাবানার এই অভিব্যক্তি।

শুধু এখানেই শেষ নয়, বদলে যাওয়া শাবানা তার বৈপ্লবিক পরিবর্তিত অনুভূতি থেকে দেশের গণমাধ্যমগুলোর কাছে অনুরোধ করেছেন, তার ছবিগুলো যেন আর গণমাধ্যমে প্রদর্শন না করা হয়। তিনি এও বলেছেন, 'তবে বাণিজ্যিক কারণে যদি তা সম্ভব না হয়

অন্তত রমযান মাসে যেন তার কোনো চলচ্চিত্র কোনো গণমাধ্যমে প্রদর্শন না করা হয়।'

চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি শিল্পী শাবানা দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকায় প্রবাস যাপন করছেন। আমেরিকার আধুনিক জীবনেও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন হিজাব ও শালীনতার শুদ্ধতায়। বাংলা কমিউনিটির কোনো অনুষ্ঠানেও খুব একটা দেখা যায় না শাবানাকে। একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কারও অনুষ্ঠানে হাজিরও হন না তিনি। এক ঘরোয়া আড্ডায় শাবানা জানিয়েছেন, এখন এই বয়সে এসে নিজের এই চরিত্রগুলো দেখলে বিব্রত হতে হয়। এ ছাড়া আমি নিজেও আমার লাইফস্টাইল বদলে নিয়েছি।'

শাবানা আজ তার লাইফস্টাইল পরিবর্তন করে বড় বাঁচা বেঁচে গেলেন। তিনি এতদিন যা করেছেন তা নিঃসন্দেহে গুনাহে জারিয়া (চলমান গুনাহ)। আর গুনাহসমূহের মধ্যে গুনাহে জারিয়া খুবই ভয়ানক ও পরকালবিনাশী পাপ। একারণেই গুনাহে জারিয়ার ব্যাপারে বান্দাকে বেশি সচেতন করা হয়েছে। মানুষ ব্যক্তিগত অনেক বড় অপরাধ করেও নিমিষেই আন্তরিক তাওবার মাধ্যমে সেই পাপ থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু একটা গুনাহে জারিয়ার দায় শোধ করা খুবই কঠিন। মুনযির ইবন জারীর থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

« مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ وِزْرُهَا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ».

'যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের প্রচলন ঘটাবে এবং অন্যরা সেটার অনুসরণ করবে তবে তার জন্য এর প্রতিদান লেখা হবে এবং এর অনুসরণকারীর অনুরূপ নেকীও লেখা হবে। অথচ তাদের প্রতিদান থেকে এতটুকু কমানো হবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি কোনো পাপ কাজের প্রচলন ঘটাবে এবং অন্যরা সেটার অনুসরণও করবে তবে সেই পাপের অন্য প্রচলনকারীর আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ যে পাপ করবে তার পাপের সামান্য অংশও তাতে হ্রাস পাবে না।' [ইবন মাজাহ্ : ২০৩; সহীহ ইবন হিব্বান : ৩৩০৮]

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

« وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلاَلَةٍ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ».

'যে ব্যক্তি পাপের দিকে আহ্বান করবে সেই পাপের দায়ভার তার ওপরেও বর্তাবে। অথচ পাপকারীরও পাপের মধ্যে কোনো ঘাটতি হবে না।' [মুয়াত্তা মালেক : ৫১৩, সহীহ]

এই হাদীসের আলোকে বিখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসে ভালো কাজের প্রচলন ঘটানোর প্রতি তাগিদ এবং মন্দকাজের প্রচলন ঘটানোর ভয়াবহতা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি কারো কৃতপাপ অন্যরা অনুসরণ করতে

থাকলে এবং তা যতদিন চলবে ততদিন সে ওই পাপের ভাগী হবে। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত চললে পাপও হবে কেয়ামত পর্যন্ত। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, শুধু মৃত্যুর পরেই নয়, জীবদ্দশাতেও সেই পাপগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

معناه إن سنها سواء كان العمل في حياته أو بعد موته والله اعلم

‘হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যে ব্যক্তি পাপ করে ও পাপের প্রচলন ঘটায় এবং অন্যরা তার অনুসরণ করে তবে তার জীবদ্দশা ও মরণের পর তার আমলনামায় ওই পাপ যুক্ত হতে থাকে।’ [শরহে নববী]

কাযী ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وهذا أصل فى أن المعونة على مالا يحل لا تحل ، قال الله تعالى : وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقد جعل الدال على الخير كفاعله وهكذا الدال على الشر كفاعله

‘এটাই মূলনীতি যে, হারাম কাজে কাউকে সহযোগিতা করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, তোমরা একে অপরকে পাপের কাজে সহযোগিতা করবে না। আর আল্লাহ তা‘আলা ভালো কাজের সহযোগীকে ভালোকাজের কর্তা এবং অনুরূপভাবে খারাপ কাজের সহযোগীকে খারাপ কাজের কর্তার অনুরূপ আখ্যায়িত করেছেন।’ [ইকমালুল মু‘লিম]

জনৈক কবি বলেন,

وَالمَرْءُ فِي مِيزانِه أَتْبَاعُهُ

'মানুষ কেয়ামতের ময়দানে তার আমলনামায় স্বীয় অনুসারীদেরকে দেখতে পাবে।'

বিব্রত ও পরিবর্তিত মানসিকতার শাবানা পাপের যে ধারা চালু করেছিলেন এর ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে তিনি তা থেকে আজ পালানোর চেষ্টা করছেন। তার এই পলায়নপরতা তীব্র ও গতিময় হোক, আমরা সেটাই কামনা করি। তবে দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, শাবানার ব্যক্তিগত অভিমতের ওপরে দেশীয় টিভি চ্যানেলগুলোর কারো কাছ থেকেই তেমন কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই তো তিনি আকুলভাবে আবেদন জানাচ্ছেন, অন্তত রমজান মাসের সম্মানেও যেন তার ছবিগুলো প্রকাশ না করা হয়। কিন্তু অর্থলিপ্সায় বিভোর গণমাধ্যম কি সাড়া দেবে তার মানবিক আবেদনে? বিশেষত বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের নৈতিকতার কাঠিটা যে তলানীতে ঠেকেছে তাতে তার এই পরকালীন ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যবসায়ীদের সাড়া দেওয়াটা কেন যেন আমার কাছে অসম্ভবই মনে হয়।

কিন্তু যারা শাবানার ভক্ত বলে দাবি করেন, তারা কি পারবেন শাবানাকে পাপের হাত থেকে বাঁচাতে? যারা ভক্ত বলে দাবি করে তার ছবিগুলো পরম আগ্রহ ভরে সিনেমা হলে কিংবা টিভির সামনে বসে দেখেছেন, আজ তার বিনীত আবেদন এবং পাপ থেকে বাঁচার আকুতির সম্মানেই না হয় ছবিগুলো দেখা বাদ দিন। এভাবে সবাই

যদি তার ছবিগুলো বয়কট করেন তবে মুনাফাখোর মিডিয়া ব্যবসায়ীরা চাইলেও তার পাপের বোঝা দীর্ঘ করতে পারবেন না। ভক্তি ও ভক্তের পরীক্ষা আসলে এখানেই। একজন পরিবর্তিত ও নতুন পথ পাওয়া নারীকে পাপ থেকে বাঁচাতে সহযোগিতা করা কি অপর মুসলমানের কর্তব্য নয়?

আমরা বিশ্বাস করি, একজন ফেরারী নারীর ঘরে ফেরাটা সকল মুসলিমের জন্য শুভ সংবাদ। এই সংবাদটার মর্ম সকলের হৃদয়ে আকুলতা সৃষ্টি করুক, অন্যদেরও ঘরে ফেরার আগ্রহ তীব্র হোক এবং ঘরফেরত নারী তার আপন নীড়ে থিতু হওয়ার স্বাদ অনুধাবন করুক- এই প্রত্যাশা করি মনেপ্রাণে।

নরকচিতায় হকের ঝাণ্ডাবাহী একজন সাহসী কুলকার্নি

বলিউডের এক সময়কার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় থেকে দূরে অবস্থান করে দর্শকদের রীতিমতো হতাশ করছিলেন। দর্শকরা সময়ের এই হিট নায়িকার শুভ প্রত্যাগমনের দিন গুণছিল। কবে তিনি মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে 'ফিরে আসার সময় হলো' বলে একটা সাক্ষাৎকার দিবেন ভেবে দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিল। তিনি সেই সাক্ষাতকার দিলেন বটে কিন্তু তাতে শুধু ভারতবাসীই নয়; বিশ্ববাসীও সমান চমকে উঠেছেন। নব্বইয়ের দশকের এই জনপ্রিয় নায়িকা জানালেন, তিনি মুসলিম হয়েছেন! এমনকি দুইবছর আগে তার স্বামীও মুসলিম হয়েছেন!

বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি জানার চেষ্টা করছি আসলে মানুষের মূল গন্তব্য কোথায়? আমরা আসলে কী? আমাদের কী করা উচিত? সেই চেষ্টা থেকেই আমি হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

আবার চলচ্চিত্রে ফেরা সম্পর্কে বলেন, ঘি আবার দুধে পরিণত হতে পারে। ঋষি বাল্মিকি ফিরে আগের ভিল্লা হতে পারে। নায়ক শাহরুখ, আমির, সালমানও বদলে যেতে পারে। কিন্তু মমতাকে আর মিডিয়ার পর্দার সামনে পাওয়া যাবে না। এটা একেবারেই অসম্ভব।' [তথ্যসূত্র : পার্বত্য নিউজ, খবরনামা]

এমন একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর আলোর পথে ফিরে আসা সত্যিই মুগ্ধকর, আশাজাগানিয়া। আরো অবাক বিষয় হচ্ছে তাঁর সাহসিকতা ও মনোবলের দৃঢ়তা। তিনি বলছেন, 'মমতাকে আর মিডিয়ার পর্দার সামনে পাওয়া যাবে না। এটা একেবারেই অসম্ভব।'

মমতা যেন হাদীসের বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » .

'তিনটি বস্তু যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর

চেয়ে প্রিয় হওয়া। দুই. মানুষকে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্যই ভালোবাসা এবং তিন. কুফর থেকে ফিরে আসার পর পুনরায় কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করা।’ [বুখারী : ১৬; মুসলিম : ৬০]

বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা যখন কারো অন্তর খুলে দেন তখন তার জন্য পৃথিবীর যাবতীয় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সহজ ও সম্ভব হয়ে ওঠে। পৃথিবীর সকল তাগুতী শক্তির কাছে তিনি থাকেন অদম্য, অপ্রতিরোধ্য। সচেতন নাগরিকমাত্রই জানেন হিন্দুস্তান একটি অতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী দেশ, যেদেশের বাসিন্দারা মুসলিমদেরকে সহ্য করতে পারে না, এমনকি কোনো মুসলিম তাদের গাড়ি-বিমানে উঠে আল্লাহ তা‘আলার নাম নেয়াও বরদাশত করে না। পাঠকদের মনে আছে কিনা জানি না, কিছুদিন আগে বাংলাদেশের এক উড়োজাহাজ কোম্পানির হিন্দুস্তানী মালিক তাদের এয়ারবাসে ‘ইনশাআল্লাহ’, ভ্রমণের দু‘আ ‘বিসমিল্লাহ ওয়া মাজরিহা’ তথা ইসলামী আচরণ ও যাবতীয় দু‘আ-দরূদ নিষিদ্ধ করেছিল। ভারতের শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং নাগরিকরাও পছন্দ করে এমন লোকদেরকে, যারা মুসলিম শিশু বাচ্চাকে তার মায়ের পেট থেকে কেটে বের করে মায়ের সামনে টুকরো টুকরো করতে পারে। এমন উগ্র হিন্দুদেরকে ভারতবাসী শ্রদ্ধা করে, যারা মুসলিম নারী-পুরুষকে জোর করে পেট্রোল খাইয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পেট্রোলবাহী জীবন্ত মানুষটার তাজা দেহ ভস্মিভূত হওয়ার তীব্র ও ভয়ানক করুণ দৃশ্য দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। ভারতে প্রায় পঞ্চাশটির মতো এমন

উগ্র ও হিংস্র সংগঠন, সংস্থা ও রাজনৈতিক দল আছে যারা সর্বদা মুসলিমের রক্ত, লাশ ও অগ্নিদগ্ধ পোড়া দেহের গন্ধে নিজেদেরকে আপ্লুত দেখতে চায়। গুজরাটের দাঙ্গা, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের চিত্র এবং বিশ্ব ইতিহাসের বড় বড় সব দাঙ্গার জন্ম দেওয়া হিন্দুস্তান সেগুলোর রাজসাক্ষী।

সুতরাং এমন একটি উগ্রবাদী ও কট্টর হিন্দুরাষ্ট্রে খোদ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে একজন জনপ্রিয় ও দর্শকনন্দিত অভিনেত্রীর আলোর পথে আসা এবং প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেওয়া নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার নয়। আজকের মমতা, আমার বোন, মুসলিমের এক নতুন সদস্য যেন ফিরআউনের জাদুকরদের মতোই সাহসী হয়ে উঠেছেন। জাদুকররা বিশাল-বিস্তৃতি মাঠে আল্লাহ হওয়ার দাবিদার ফিরআউন ও তার বিশাল বাহিনীর সামনে হকের দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান এক মুসা ‘‘আলাইহিস সালামের অবিচলতা দেখে বিস্মিত, বিমোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয়, অসম লড়াই। কারণ ফিরআউন তৎক্ষণাত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডান হাত ও বাম পা কর্তন করে তাদেরকে চিরতরে পঙ্গু করার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার যে, যারা এক মুহূর্ত আগে স্রষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিল তারাই এখন মুসা ‘আলাইহিস সালামের ঈমানী শক্তির বদৌলতে নকল স্রষ্টার বিরুদ্ধে, কাট্টা কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন!

মমতা এপর্যন্ত বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মালায়লাম ও কানাড়ি শিল্পে প্রায় অর্ধশতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। সর্বশেষ অভিনীত ছবি ছিল ২০০২ সালে। বলিউডে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং আবেদনময়ী নায়িকা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সেই মমতার পক্ষে এমন একটা প্লাটফর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করার মতো দুঃসাহস দেখানো নিঃসন্দেহে নারীজাতির দীপ্তপদচারণার নজির হয়ে থাকবে।

অনেক সময় পথভ্রষ্ট করার চক্রান্ত পথহারা পথিকের সুপথ পাওয়ার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এর নজির আমরা জানতে পারি ইসলামের ইতিহাসে, মক্কার কুরায়শদের কুচক্রান্তের ঘটনায়। রাসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় হজ করতে আসা লোকদেরকে দীনের দাওয়াত প্রদান করবেন এই আশঙ্কায় মক্কার অলিতে গলিতে আগে থেকেই লোক বসিয়ে দেওয়া হয় তাঁর নামে কুৎসা রটনা করতে। নেতাদের আদেশ মোতাবেক এই চেলা-চামুন্ডারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আনীত দীনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। এতে হিতে বিপরীত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে আগত লোকেরা এই নতুন ধর্মের প্রবর্তক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এভাবেই অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কুরাইশরা কুৎসা রটনা না করলে তারা নবী সম্পর্কে জানতেনই না এবং ইসলাম গ্রহণেরও সুযোগ মিলত না।

ঠিক কুরাইশদের দেখানো পথেই হাঁটছে আজকের ইসলামবিদ্বেষীচক্র। ওরা বিভিন্নভাবে নারী সমাজকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষীপ্ত করতে গিয়ে অনেক বিধর্মী নারীকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে, ইসলামকে মানতে অনুপ্রাণিত করছে। এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে নারীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রবণতা এমন সব রাষ্ট্রে বেশিমাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে, পর্দার বিরুদ্ধে অলঙ্ঘনীয় সংবিধান চালু করে রেখেছে! ইনশাআল্লাহ, শত্রুরা না চাইলেও এভাবেই অব্যাহত থাকবে ইসলামের অগ্রযাত্রা, বিজয় নিশান। ভারতের মতো ইসলামবিদ্বেষী রাষ্ট্রগুলোতেও ফিরআউনের জাদুকরদের মতো গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে মমতা কুলকার্নির মতো নারীরা ইসলামের পতাকাতলে আশ্রিত হবেন। তাই নারীরা শুধু অবলার দুর্বলতায় অভিযুক্তই নয়; সাহসের উপমা হিসেবেও সমান দক্ষ। সালাম, মমতা তোমাকে!

স্যুপের হাঁড়িতে কন্যাসন্তান : নারীসত্তায় এ কোন কলঙ্ক?

পৃথিবীর দুটি বিষয়ের প্রতি মানুষ সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট। নারী ও প্রকৃতিগত রিপু। এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির অন্তরঙ্গতার বিষয়টি কারো অজানা নয়। নারী তো মানবসমাজের অর্ধাংশ, পৃথিবীর মানবসভ্যতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে পুরুষের নিত্যসঙ্গী। আর আল্লাহপ্রদত্ত জৈবিক প্রয়োজনও মানুষের অস্তিত্বের জন্যই অপরিহার্য।

তবে জৈবিকশক্তি নিছক ভোগের জন্য নয়। বরং তা এক বিরাট আমানত। একজন পুরুষ ওই কৃষকের মতো, যে ভূমিতে বীজ রোপণ করে ফসল ফলানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং নারী ওই উর্বর ভূমির মতো, যে ফসল ফলায়। আল্লাহর কুদরতে একটি সুন্দর ধারার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে জীবনের বহু ধারা; বিয়ের মাধ্যমে বৈধ জৈবিক বন্ধন-ব্যবস্থা না থাকলে যে ধারাগুলো ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মানবসভ্যতাও অচল হয়ে পড়বে। সেই পবিত্র ও সুশৃঙ্খল ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে জৈবিকশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য।

ইমাম গাযালী রহিমাহুল্লাহ বলেন, জৈবিকশক্তি কেবল এজন্য নয় যে, সাময়িক কিছু আনন্দ লাভ করল এবং এর ফলশ্রুতিতে বাচ্চার আগমন ঘটল। বরং এর আরেকটি বিরাট হেকমত রয়েছে। সেটা হচ্ছে, মানবজাতির জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে নারী-পুরুষের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এবং এটার পূর্ণতা পায় যৌনাচার দ্বারা।

আশরাফুল জওয়াব গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, পৃথিবীতে জৈবিক সুখের চেয়ে আকর্ষণীয় কোনো নেয়ামত নেই। কিন্তু এই নেয়ামত যেমনই আকর্ষণীয় তেমনিই ক্ষণস্থায়ী। মানুষ এই আকর্ষণীয় নেয়ামতটি দীর্ঘস্থায়ী করতে যতই কসরত করুক না কেন সে তাতে সক্ষম নয়। চূড়ান্ত মুহূর্তে তাকে পরাজিত হতেই হয়। সুতরাং মানুষ যেন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং এমন এক স্থান ও সঙ্গীর সন্ধান করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে যেখানে এই সুখের ইতি নেই। বলাবাহুল্য,

সেই স্থানটি হচ্ছে জান্নাত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, জৈবিকশক্তি আনন্দ লাভের উপলক্ষ্য নয় মাত্র, বরং তা জান্নাতের দিকে আকর্ষণ করার একটি বিরাট মাধ্যমও বটে। এদিকে মানুষকে যদি জৈবিকশক্তি প্রদান না করা হতো তবে জান্নাতের মর্ম ও সেখানকার অপরিসীম নেয়ামতের কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি হত না তাদের। একজন যৌনাক্ষম (ইন্নিন ও শিশু) কি বোঝে এর মর্ম? কিংবা একজন পাগল কি বোঝে রাজক্ষমতার মাহাত্ম্য? তাই মানুষের মধ্যে যদি এই শক্তি সঞ্চারিত না করা হতো তবে দুনিয়া যেমন তার কাছে আকর্ষণহীন হয়ে পড়ত তেমনিভাবে জান্নাতের দিকেও আকর্ষণ করা দুঃসাধ্য হতো।

তাই মানুষকে জান্নাতমুখী করতে এবং জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র উপায় ঈমান ও আমলে মজবুত করে তোলার পেছনে যৌনশক্তি নামের এই নেয়ামতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

মোটকথা, মানুষের জীবনে দুটি দিক রয়েছে। ইহকালীন ও পরকালীন। পরকালের জীবন এমন এক জীবন, যার সুখ-ঐশ্বর্য অনুধাবন করতে গিয়ে মানবমণ্ডলির জ্ঞান ভোঁতা ও হতভম্ব হয়ে যাবে। কিন্তু সেগুলো সম্বন্ধে একেবারেই প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য দুনিয়ায় কিঞ্চিত সুখ ও নেয়ামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই বিস্ময়-বিমুগ্ধকর নেয়ামতের অধিকারী হওয়ার জন্য যেমন এই শক্তিকে বৈধ পথে ব্যবহার করার গুরুত্ব অপরিসীম ঠিক তদ্রুপ ব্যর্থ হলে এর ক্ষতিও অপূরণীয়। এ কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করে জৈবিকশক্তির

যথাযথ ব্যবহার করে না তার হজ পূর্ণতা পায় না। বিখ্যাত মুফাসসির ইকরামা ও মুজাহিদ রহিমাহুমাল্লাহ বলেন,

في معنى قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أنه لا يصبر عن النساء

'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে' আয়াতের অর্থ হলো, তারা নারী ছাড়া সবর করতে পারে না।'

ফাইয়াজ ইবনে নুজাই রহিমাহুল্লাহ বলেন,

إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله وبعضهم يقول ذهب ثلث دينه

'যখন পুরুষের চাহিদা জেগে ওঠে তখন তার জ্ঞানের এক তৃতীয়াংশ লোপ পায়। আর কেউ কেউ বলেন, তার দীনের এক তৃতীয়াংশ লোপ পায়।'

নাওয়াদিরুত তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে-

ومن شر غاسق إذا وقب قال قيام الذكر ومن شر غاسق إذا وقب

আয়াতের অর্থ হচ্ছে, পুরুষের চাহিদার তীব্রতার অনিষ্ট।'

ইমাম গাযালী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বস্তুত এটা হচ্ছে এমন এক শক্তি, যখন তা দুর্বল মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যায়। দীন ও আকল তখন সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِى لُبٍّ مِنْكُنَّ

‘জ্ঞানে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানীদেরকে ধরাশায়ী করার ব্যাপারে নারীদের মতো পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি।’

নারীর প্রতি পুরুষের এই তীব্র টান সৃষ্টি হয় কামনার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে এবং চোখ এই কামনাকে চরমভাবে উস্কে দেয়। একারণে চোখের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন। শুতাইর ইবন শাকাল ইবন হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَلِسَانِي وَقَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي»

‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি দু‘আ শিক্ষা দিন যাতে আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন, তুমি (নিম্নের দু‘আটি) পড়বে,

‘হে আল্লাহ, আমাকে আপনি হেফাযত করুন নিজের কান ও চোখ এবং জিহ্বা ও মনের অকল্যাণ থেকে আর আমার বীর্যের (লজ্জাস্থানের) অনিষ্ট থেকে।’ [সুনান নাসাঈ : ৫৪৫৬, শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন।]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, জৈবিক চাহিদা মানবজীবনের অপরিহার্য একটি অংশ এবং বিভিন্ন হেকমত ও

প্রজ্ঞার আলোকেই বান্দাকে এ বস্তু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেই সূচনা থেকেই নারীর প্রতি আকর্ষণ ও কামাচারারে সীমালঙ্ঘন করে আসছে। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই মূলত বড় বড় ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নারীর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করতে গিয়ে সর্বপ্রথম ধরাপৃষ্ঠে রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এমন :

আদম 'আলাইহিস সালাম ও হাওয়া 'আলাইহাস সালাম পৃথিবীতে আসেন এবং তাঁদের মাধ্যমে সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার শুরু হয়। প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভাইবোন ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো মানুষ ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা আদম 'আলাইহিস সালামের শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন, একই গর্ভ থেকে যে জমজ পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে তারা পরস্পরে সহোদর ভাই-বোন হিসাবে গণ্য হবে এবং কেবল তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণকারী কন্যা সহোদর বোন হিসাবে গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধন বৈধ হবে।

কিন্তু কাবিল এই বিধানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করল। ঐতিহাসিকগণ এর একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। আমরা ঐতিহাসিক সূত্র বিশ্লেষণ না করে শুধু কয়েকটি কারণ তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ তারিখে তাবারীতে উল্লেখ করেন, আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস সালাম জান্নাতে মিলিত হয়েছিলেন। ওই মিলনে যে জমজ সন্তানের জন্ম হয় তারা হলেন কাবিল ও ইকলিমা। এরপর তারা দুনিয়ায় পদার্পণ করলে হাবিল ও তার জমজ বোন লিওজার জন্ম হয়। আদম 'আলাইহিস সালাম ছেলেদেরকে বিধান অনুযায়ী বিয়ে করার আদেশ করলে কাবিল তা প্রত্যাখান করে। তাবারী রহিমাহুল্লাহ লিখেন,

وكره تكرما عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل وقال نحن ولادة الجنة وهما من ولادة الارض وأنا أحق بأختي ويقول بعض أهل العلم من أهل الكتاب الاول بل كانت أخت قين من أحسن الناس فضن بها عن أخيه وأرادها لنفسه والله أعلم

'কিন্তু কাবিল তা প্রত্যাখান করে এবং বলে আমরা জান্নাতের সন্তান আর তারা দুনিয়ার সন্তান। সুতরাং আমি ইকলিমার বেশি হকদার। আর পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের কতক আহলে ইলম বলেন, বরং মূল ঘটনা হচ্ছে 'কীন' (কাবিলের আরেক নাম) এর সহজাত সহোদর বোন ছিল পরমা সুন্দরী। তাই সে তাকে নিজের জন্য চাইল।' [তাফসীরু তাবারী : ১০/২০৬]

যাহোক, ইতিহাসের সারকথা হচ্ছে, হাবিলের সহজাত সহোদরা বোন লিওজা ছিল কুশ্রী। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুসারে হাবিলের সহজাত কুশ্রী বোনটি কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হলো এবং শরীয়তে আদমের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারল না।

কাজেই কাবিল হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জিদ ধরল, আমার সহোদরা বোনকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। আদম ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় শরীয়তের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আবদার প্রত্যাখান করলেন। এরপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা উভয়ই আল্লাহর জন্য নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী কবুল হবে, তার সঙ্গে লিওজাকে বিয়ে দেওয়া হবে। আদম ‘আলাইহিস সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, যে সত্যের পথে আছে কেবল তার কুরবানীই গৃহীত হবে। তৎকালীন কুরবানী গৃহীত হওয়ার নিদর্শন অনুযায়ী হাবিলের কুরবানী কবুল হলো এবং কাবিলের কুরবানী হলো প্রত্যাখ্যাত। ফলে কাবিল আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং স্বীয় ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করল।

এভাবে পৃথিবীতে নারীকে কেন্দ্র করেই সূচিত হলো মানুষ হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহ অপরাধ। যে অপরাধকে আল্লাহ তা‘আলা গোটা পৃথিবী ধ্বংস করার মতো মারাত্মক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢ ﴾ [المائدة: ٣٢]

‘এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের ওপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর জমিনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।’ {সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩২}

নারীকে কেন্দ্র করে কাবিল যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল সেটার ধারাবাহিকতায় কেয়ামত পর্যন্ত যত খুন-খারাবী সংঘটিত হবে হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী তার একটা অংশ তার আমলনামায় যুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا »

‘পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যত হত্যাকাণ্ড ঘটবে তার একটা হিস্যা আদমপুত্র কাবিলের আমলনামায় যুক্ত হবে। কেননা সেই সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের প্রচলন ঘটিয়েছে।’ [বুখারী : ৭৩২১]

নারীকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দাগ আজও বিদ্যমান। রক্তের সেই চিহ্ন আজও প্রবহমান। বিখ্যাত মুফাসসির ইবনুল আরাবী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

وَعَلَى الْغُرَابِ جَبَلِهَا دَمُ هَابِيلَ فِي الْحَجَرِ جَارٍ لَمْ تُغَيِّرْهُ اللَّيَالِي وَلَا أَثَّرَتْ فِيهِ الْأَيَّامُ ،وَلَا ابْتَلَعَتْهُ الْأَرْضُ

‘হত্যাকাণ্ডের ওই স্থানে পাথরের ওপর হাবিলের রক্ত এখনও প্রবাহমান। দিনরাতের দীর্ঘপরিক্রমায় তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি। মাটিও সেই রক্ত চুষে নেয়ার সক্ষমতা রাখেনি।’ [তাফসীর আহকামুল কুরআন : ৮/৪৯]

সত্যি! নারীর ইতিহাস বর্ণিল, নারীজীবনকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ বিচিত্র! যুগের আবর্তনে নিঃশেষ হয় না এদের স্মৃতি!

আর জৈবিকতার উন্মাদনা আরো বেশি রক্তাভ। কখনও কখনও ঘটেছে এমন অনেক ঘটনা যা একই সঙ্গে চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন পারস্য সম্রাটের ইতিহাস স্মরণ করা যেতে পারে। ওই সম্রাট তার বার্ধক্যে একজন সুন্দরী রমণীকে বধূ করে ঘরে আনলে সৎমার প্রতি নজর পড়ে সম্রাটের ঔরষজাত বড় ছেলের। বিষয়টি সম্রাট পিতা টের পান এবং এ কারণে সন্তানের হাতে প্রাণ হারানোর আশঙ্কাও করেন তিনি। ফলে সম্রাট পিতাও সন্তানের প্রাণবধের পরিকল্পনা আঁটেন এবং সন্তানের হাতে প্রাণ হারালে পাল্টা প্রতিশোধের অগ্রিম ব্যবস্থা করে যান।

শঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়। সুন্দরী সৎমাকে নিজের করে নেওয়ার বাসনায় প্রচণ্ড কামুক শাহজাদা সত্যই সম্রাট পিতার প্রাণবধ করেন। এরপর বিজয়ের হাসিতে সৎমার ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে প্রবেশ করে ঘরের আলমারিতে সারিবদ্ধ একটি বোতলের ওপর দৃষ্টি আটকে যায় তার। বোতলের গায়ে ফার্সিতে স্পষ্ট করে লেখা (قوة باه) ‘যৌনশক্তিবর্ধক হালুয়া’। শক্তিবর্ধক বোতলটা যেন শাহজাদার উপরি

উপহার হিসেবে হাজির হলো! কামনার ঘৃতে আরেকটু আগুন পড়ল তার। শিহরিত পদবিক্ষেপে সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং পিতার ‘উত্তরাধিকার’ গ্রহণ করার আগে ‘হালুয়া’টা সেবন করা দরকার বলে মনে করলেন। এরপর আগপিছ না ভেবে ‘হালুয়া’টা গলধঃকরণ করলেন। হালুয়া সেবনের অল্প সময়ের মধ্যে তার চেহারা বিকৃত হতে লাগল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢিলে হয়ে আসতে লাগল এবং শাহজাদা শেষ পর্যন্ত পিতার যৌনশক্তিবর্ধক হালুয়া নামের বিষ খেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

আসলে পিতাই এই প্রক্রিয়া করে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, শাহজাদা অত্যন্ত যৌনকাতর এবং একারণেই হয়ত সন্তানের হাতে তার প্রাণ হারানো হতে পারে। সুতরাং সেরকম কিছু হলে তাকেও তার সঙ্গে রওয়ানা হতে হবে। তাই তিনি এমন একটা কৌশল গ্রহণ করলেন, যা দেখে শাহজাদার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে এবং নিজেই নিজের মৃত্যুর ফাঁদ রচনা করেন।

ইতিহাসের এই উথাল-পাতাল ধারাবাহিকতা অনুযায়ীই চলছে নারী আর জৈবিক শক্তিকে কেন্দ্র করে জীবন দেওয়া-নেওয়ার মহড়া। এই মহড়া দিনে দিনে আরও তীব্র ও অতি ভয়ানক হয়ে উঠছে, যা আধুনিক সভ্যতার গায়ে সাধারণ নয়; মহা তিলকের চিহ্ন হয়ে উঠছে। নারী ও জৈবিকতা নিয়ে মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত চীন। এরা যৌন শক্তি বাড়াতে শেষ পর্যন্ত খাওয়া শুরু করেছে মানবভ্রুণ ও মৃত বাচ্চা দিয়ে তৈরি স্যুপ! চরম ঘৃণিত এই কাজের খবর পুরো বিশ্বকে হতবিহবল করে দেয়। কিছুদিন আগে

২০১৩ সালের ২৫ জুলাই দক্ষিণ কোরিয়ার ‘সিউল টাইমস’ এর কাছে একটি ইমেইল আসে যাতে ছিল বেশ কিছু ছবি। এ ভয়াবহ, বীভৎস ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ছবিগুলোতে দেখা যায় মৃতশিশু ও নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গর্ভপাত ঘটানো অপূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ বা ফিটাসের স্যুপতৈরি করা হচ্ছে মানুষের খাওয়ার জন্য!

আরো প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে। চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ ক্যানটন বা গুয়াংডন এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। জানা যায় সেখানকার পুরুষরা তাদের শারীরিক সুস্থতা ও যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ভেষজ শিশু স্যুপ (herbal baby soup) খেয়ে থাকে! এরকম অবস্থায় জানা গেল আরেক ঘটনা। চীনের এক দম্পতির ইতোমধ্যেই একটি কন্যাসন্তান ছিল। মহিলাটি সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারলেন, তার দ্বিতীয় সন্তানটিও মেয়ে হতে যাচ্ছে। ততদিনে তার গর্ভস্থ সন্তানের বয়স ৫ মাস। তিনি ও তার স্বামী গর্ভপাত করানোর সিদ্ধান্ত নেন। স্বাভাবিকভাবে কোনো শিশু যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মারা যায় তবে তাতে ২০০০ ইউয়ান খরচ হয়, সেখানে গর্ভপাত করাতে খরচ হয় মাত্র কয়েকশো ইউয়ান। তবে যারা মৃত শিশু বিক্রি করতে চান না, তারা ইচ্ছা করলে প্লাসেন্টা বা জীবিত অবস্থায় বিক্রি করতে পারেন।

একজন স্থানীয় সাংবাদিকের মতে, এই সমস্যার উৎপত্তি মূলত হয়েছে চীনাদের মাত্রাতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচেতনতার কারণে। এছাড়া অনেকের মতে, চীন সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ‘এক সন্তান নীতি’ চালু করেছিল। আর এ হতভাগ্য শিশুগুলো এ নীতিরই নির্মম

শিকার। এছাড়া চীনের অধিকাংশ পরিবার মেয়ে সন্তান নয়, ছেলে সন্তান আশা করে। গরীব পরিবারগুলো তাদের মেয়ে শিশুদের বিক্রি করে দেয় অর্থের আশায়। চরম ঘৃণিত 'বেবি স্যুপ' এর উদ্ভব এই মানসিকতা থেকেই। তাইওয়ানে মৃত শিশুরা ৭০ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয় গ্রিল করা 'রুচিকর' (?) খাবার হিসেবে!

হং কং থেকে প্রকাশিত NEXT সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনে শিশুদের মৃতদেহ কিংবা ভ্রুণ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার নতুন উপকরণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এছাড়া প্লাসেন্টা বা অ-মরাকে সুস্বাদু খাবার হিসেবে খাওয়া হয়। এমনকি গুয়াংডনে হাসপাতালগুলোর মাধ্যমেই অনেক সময় এসব অঙ্গ কেনাবেচা হয় এবং এগুলোর চাহিদাও আকাশচুম্বী। ম্যাগাজিনের অনুসন্ধানী প্রতিনিধিরা এগিয়ে যেতে থাকেন। নরমাংস ভক্ষণের নতুন এই রীতি তাদেরকে নিয়ে যায় চীনের আরেক প্রদেশ লিয়াওনিং-এ।

ম্যাগাজিনটির মতে, লিয়াওনিং এর একজন তাইওয়ানিজ ব্যবসায়ী একটি ভোজসভা আয়োজন করেন। তার একজন গৃহপরিচারিকা ছিল যাকে সবাই মিস লিউ নামেই চিনতো। মিস লিউ ছিলেন লিয়াওনিং এর স্থানীয় অধিবাসী। ভোজের দিন অসাবধানতাবশত তার মানব শিশু ভক্ষণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায়।

ভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত তাইওয়ানিজ মহিলারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মিস লিউ পরে এও বলেন, অনেক মানুষই মানবশিশু খেতে

আগ্রহী, তবে চাহিদা অনেক বেশি। যাদের ক্ষমতা অনেক বেশি তারাই কেবল সবচেয়ে ‘ভালো জিনিস’ পায়। সাধারণভাবে ছেলে শিশু ভ্রুণকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বলে ধরা হয়। প্রতিবেদকের অনুরোধে মিস লিউ কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে প্রতিবেদককে সেই জায়গায় নিয়ে যান যেখানে মানবভ্রুণ রান্না করা হয়। তিনি দেখলেন, একজন মহিলা একটি ছুরি দিয়ে ছেলে শিশু ভ্রুণ কেটে কুচি কুচি করছেন তারপর তা দিয়ে স্যুপ তৈরি করছেন। আর আশেপাশের মানুষকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটি ’প্রাণীর মাংস’। অনেক চীনার কাছে মানবভ্রুণ ভক্ষণ করা নাকি এক ধরনের শিল্প!

২২ মার্চ, ২০০৩। গুয়াংজি প্রদেশের বিংইয়ন পুলিশ একটি ট্রাক থেকে ২৮টি মেয়ে শিশু উদ্ধার করে, যাদেরকে পাচার করা হচ্ছিলো আনহুই প্রদেশে। শিশুগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় বাচ্চাটির বয়স ছিল মাত্র তিন মাস। তিন-চারটি শিশুকে একটি একটি করে ব্যাগে ঢোকানো হয়। উদ্ধারের সময় শিশুগুলো প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল।

৯ অক্টোবর, ২০০৪ এর সকালবেলা। সুজহৌ এলাকার জিউকুয়ান শহরের এক ব্যক্তি আবর্জনা পরিষ্কারের সময় বেশ কিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন শিশুর দেহ আবিষ্কার করেন। দুটি মাথা, ছয়টি পা, চারটি হাত, দুটি মাথা পাওয়া গেল। তদন্তে জানা গেল, শিশুগুলো মাত্রই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, এদের বয়স হয়েছিল ১ সপ্তাহ। রান্নার পরে খাওয়া শেষে হাত-পাগুলো উচ্ছিষ্ট হিসেবে ফেলে দেওয়া হয় ডাস্টবিনে!

যদিও মানবভ্রুণ খাওয়া নিষিদ্ধ করে চীনে কঠোর আইন চালু আছে, কিন্তু একইসঙ্গে চীনের 'এক সন্তান' নীতি অনেক দম্পতিকে অকালে গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য করে, যেগুলোর সুযোগ নিচ্ছে একদল জঘন্য মানুষ। এছাড়া মাও সেতুং এর 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' কিছু ক্ষেত্রে চরমপন্থীরূপ ধারণ করে, যার ফলে চীনের অনেকের মাঝেই নৈতিকতা ও মানুষের জীবনের প্রতি সম্মান দেখানোর প্রবণতা কমে গেছে।

গ্লোবাল রিপোর্টারস ভিয়েনার তাই জরুরি আহ্বান, নরমাংস ভক্ষণকে 'না' বলুন এবং নিষ্পাপ শিশুদের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। এই তথ্যটি প্রকাশ করে হয়তো সেই সব নিষ্পাপ শিশুদের বাঁচাতে পারবেন যারা হয়তো নির্মম ও জঘন্য হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে যাচ্ছে। [তথ্যসূত্র : হ্যালো টুডে ২৬ নভেম্বর, ১৩ ইং]

পাঠক! এবার আপনার নিজস্ব বিবেক দিয়ে বিচার করুন, আমরা কোন্ সভ্যতার যুগে বাস করছি? এখানে জৈবিক ও পাশবিক শক্তি এত অদম্য হয়ে উঠছে যে, নিজ সন্তান, মৃত বাচ্চা এবং ভ্রুণ খাওয়াও অতি লোভনীয় ব্যাপারে পরিণত হয়েছে! এরচেয়ে পারস্য সম্রাট ও শাহজাদার ঘটনা তুচ্ছ ও স্বাভাবিক নয় কি?

বস্তুতঃ আল্লাহর এক বিধান লঙ্ঘন করায় সৃষ্টি হচ্ছে মানবিক বিপর্যয়। এক আদেশ লঙ্ঘন ডেকে আনছে হাজারও বিশৃঙ্খলা। মানুষের সহজাত প্রকৃতির মূল্যায়ন করে ইসলাম দম্পতিদেরকে অধিক সন্তান নেয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। কিন্তু চীনারা সেই

স্বাভাবিক প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে এক সন্তান রীতি চালু করল। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত ব্যবস্থায় হাত দিয়ে যা হয় চীনাদের বেলায়ও তাই হতে লাগল। পাইকারিহারে মানব তথা ভ্রূণ হত্যা চালু হলো। কারণ এক সন্তানের বেশি নেয়া যাবে না। আবার দম্পতিরা মেয়ে সন্তান নিতেও রাজি নয়।

তাই পেটে সন্তান আসার পর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কন্যাসন্তান সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তাদেরকে মেরে ফেলো এবং পারলে ভ্রূণখোরদের কাছে চড়া মূল্যে বিক্রি করে উপরি কিছু মাল কামাও! জাহেলি যুগের পিতারা তো কন্যাসন্তানকে দাফন করত, আধুনিক জাহেলিয়াত দেখি তাদেরকে ভক্ষণ করা শুরু করেছে!

এভাবেই চলছে পাপের পিঠে পাপ। এক পাপের পরিণতি ভোগ করতে না পেরে আরেক পাপের জন্মদান! আজ জৈবিক প্রবৃদ্ধির কারণে মানুষ মানুষ খাচ্ছে, ভ্রূণ খাচ্ছে! কল্পনা করা যায়? জৈবিক তাড়না বৃদ্ধি কেবল মানুষের পরকাল, নৈতিকতাই ধ্বংস ডেকে আনে না, জাগতিক সুখ-শান্তি ও শারীরিক ধ্বংসও ডেকে আনে। কাযী ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا و الآخرة ، جالب لأدواء الجسد وخثار النفس ، وامتلاء الدماغ ، وقلته دليل على القناعة ، و ملك النفس، وقمع الشهوة مسبب للصحة ، و صفاء الخاطر، و حدة الذهن

'প্রবৃত্তির প্রাবল্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ। শারীরিক নানা রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি ও মানসিক বৈকল্যের সূত্র।

পক্ষান্তরে এর পরিমিত প্রভাব ও স্বাভাবিকতা মানবিক সুস্থতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিচয়। আর কুপ্রবৃত্তি দমন ও চূর্ণ করা শারীরিক সুস্থতা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও মেধার তীক্ষ্ণতার লক্ষণ।' [তথ্যসূত্র : আশ-শিফা বিতা'রিফী হুকুকিল মুস্তাফা]

দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ ভাবনার উপেক্ষা, শারীরিক ও মানবিক সুস্থতার প্রতি অবজ্ঞা আর আল্লাহর বিধান পালনের অনীহায় ধ্বংসের আগুনে জ্বলছে নারী। যে ধোঁকাবাজ পুরুষ নারীর আগমন বরদাশত করতে পারে না, যন্ত্রের সাহায্যে তার নারীত্ব চিহ্নিত করে শুধু হত্যাই করে না, স্যুপ বানিয়ে খেয়ে ফেলে, আধুনিক সভ্যতার যে পুরুষরা জাহেলি সভ্যতাকে পেছনে ফেলে নারীত্বের অবমাননার সকল ধাপ অতিক্রম করেছে সেই পুরুষের 'নারী অধিকারের' স্লোগানে বিভ্রান্ত হয়! এসব লম্পট, নারী-ইজ্জতহরণকারীরা নারীর সম্মানজনক ও নিয়ন্ত্রিত-নিরাপদ চলাফেরার দাবি জানালে তাদেরকে মৌলবাদী বলে খিস্তিখেউর করে! ওরাই আবার হয় দেশের হর্তাকর্তা। সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর মিনা ফারাহ একটি জাতীয় দৈনিকে ৫ ডিসেম্বর ১৩' এর উপসম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, মন্ত্রীসভায় এমন কিছু লোক আছে যাদের দেখে বমি করতে ইচ্ছা হয়... জানি না লেখিকার বমোনিচ্ছার কারণ কী। তবে বিবেকবান লোকেরা অবশ্যই ওইসব মন্ত্রীদের দেখলে কিংবা নাম শুনলে বমনেচ্ছা জাগে, যারা নিজেরা নারীদের ইজ্জত হরণ করে উলামায়ে কেরামকে বিদ্রূপ করে, কথায় কথায় তাদেরকে তেঁতুল হুজুর বলে খিস্তিখেউর করে।

পৌত্তলিক কুসংস্কৃতি ও তারুণ্যের উদ্ভাবনীশক্তি ধ্বংসে নারী!

ইতিহাস ও জীবচালিতের দিকনির্দেশনামূলক গ্রন্থরাজির খোলাপাতার সবচেয়ে উজ্জ্বল, সর্বাধিক আলোচিত ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যৌবন ও তারুণ্যের শক্তি। বস্তুত সময়ের কয়েকটি সমষ্টি নিয়ে মানুষের জীবন। দিন গত হয় আর মানুষের জীবনবৃক্ষ থেকে একেকটি করে পাতা খসে পড়ে। প্রতিটি বস্তুর একটি মোক্ষম সময় থাকে এবং ওই সময়ে ওই বস্তুর সৃষ্টিস্বার্থকতা নিহিত থাকে। বৃক্ষ জন্ম নিয়েই ফল দেওয়া শুরু করে না এবং একেবারে বুড়ো হয়ে যাওয়ার পরও ফল দেয় না। বরং ফল দেয়ার একটা মোক্ষম ও উপযুক্ত সময় থাকে; যেটাকে বলে বৃক্ষের যৌবনকাল। এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতিটি বস্তুর সেরাকাল পাওয়া যায়। তেমনি সৃষ্টির সেরা মানবজাতিরও সময়ের সেরা একটি অংশ আছে। সময়ের ওই অংশটাই তার ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-বিলাস ও জন্মের স্বার্থকতার মূল স্তম্ভ। মানুষের জীবনের সেই সেরাকালটা হচ্ছে যৌবনকাল।

এই সময়ের সদ্ব্যবহার মানুষকে দুনিয়া ও পরকালীন সফলতার সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে যেতে সক্ষম। পক্ষান্তরে এর অপব্যবহার মানবজীবনকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে, যে ক্ষতির কোনো কাজা-কাফফারা নেই। তাই সময়ের গুরুত্ব শুধু আখেরাতের বিচারেই নয়; দুনিয়ার বিচারেও। পার্থিব সাফল্য পেতে হলেও

অবশ্যই মানুষকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করতে হয় সময়কে। যারা পার্থিব সাফল্য পেয়েছেন তারাও সময়ের মূল্যায়নের কারণেই তা পেয়েছেন। উদাস, কর্মস্পৃহাহীন এবং অপরিকল্পিত জীবনধারণকারী তরুণ ও যুবক স্মরণীয় কোনো সাফল্য পেয়েছে বলে ইতিহাস স্বীকার করে না। আর পারলৌকিক জীবনের সাফল্যের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে যৌবন ও তারুণ্যের উদ্যোমীশক্তির যথার্থ ও সঠিক ব্যবহার। সঙ্গত কারণেই হাদীসের বহু স্থানে তরুণ ও যৌবনকালের কথা বলা হয়েছে এবং এর সদ্ব্যবহারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

যৌবনকালে নিয়মিত নেক আমল করলে বার্ধক্যের অক্ষমতায় যখন আমল করার সক্ষমতা থাকবে না তখনও আমল লিপিবদ্ধ হওয়ার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে। পার্থিব জীবনেও আমরা এর বাস্তব ও চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে থাকি। সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তার যৌবনকাল ও সক্ষমতার সময় তার সেবার মূল্যায়ন করে নিয়মিত ভাতা প্রদান করা হয়। তাই নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়, যৌবন ও তারুণ্যের এই সময়টাই মানবজীবনের উন্নতি-অগ্রগতির সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়েই তরুণ ও যুবকদেরকে সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতে হবে। আর তা না করলে এবং যৌবন ও তারুণ্যের উদ্যমশক্তির অপব্যবহার করলে সাফল্যের সম্ভাবনা থেকে ছিটকে ব্যর্থতার তিমিরসম আঁধারে হারিয়ে যেতে পারে।

তারুণ্যের এই সময়টা এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই এত স্পর্শকাতরও বটে। সাগরের উন্মাতাল ঝড়ের মতোই এর স্পর্ধা ও উন্মত্ততা।

নাজুকস্পর্শ ও ব্যবহারের নূন্যতম গাফলতিতে মূল্যবান এই সম্পদ ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। ঝড়কবলিত মাস্তুল শক্তহাতে ধারণ ও পরিচালনা করতে না পারলে মধ্যসাগরে ডুবে যেতে পারে 'তারুণ্যবাহী' যাত্রী। আরবরা বলতেন, 'যৌবন ও তারুণ্য হচ্ছে পাগলামির একটা শাখা।'

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন, মানুষের মধ্যে দশটি স্বভাব আছে। যার নয়টি ভালো এবং একটি মন্দ। এই এক মন্দই নয় ভালোকে নষ্ট করে দেয়। এরপর তিনি শ্রোতাদেরকে তারুণ্যের 'উচ্ছৃঙ্খল উদ্দীপনা'র ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وايا ك وعثرة الشباب

'অবশ্যই যৌবন ও তারুণ্যের পদস্খলন থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে।'

ইতিহাসে আমরা যাদেরকে দিগ্বিজয়ী, কীর্তিমান ও সার্বিক সাফল্যের উপমা বলে জানি, তাঁদের সাফল্যের সিঁড়ি ছিল যৌবনকালের সদ্ব্যবহার। তারিক বিন যিয়াদ একমাত্র তারুণ্যের উদ্যোমীশক্তির বলেই পশ্চাতে অথৈ ও রাশি রাশি পানি আর সামনে অচেনা, দুর্গম-রনাঙ্গনে শত্রুর মুখোমুখি হয়েও বাহনের জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার ঐতিহাসিক ও অবিশ্বাস্য দুঃসাহস দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম তারুণ্যের টগবগে রক্তবলেই ভারত উপমহাদেশে ইসলামী সালতানাতের মানচিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই এখানকার মাটির সুগভীরে প্রোথিত হয়েছিল

ইসলামের বৃক্ষরাজি। তারুণ্যের এই বিজয়গাঁথা ও বিজয় রচনার ইতিহাস বিস্তৃত, ব্যাপক ও সার্বজনীন। বিজয় ও সাফল্যের প্রতিটি রনাঙ্গনে ছড়িয়ে আছে যৌবন ও তারুণ্যের তাজাখুন, উদ্দীপ্ত উপস্থিতি। তাই প্রতিটি জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তাদের যুবক ও তরুণ জনগোষ্ঠী। সুতরাং যারা বুদ্ধিমান, যারা ইতিহাসের গতিপথ ও সাফল্যের চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রাখতে চায় তারা তারুণ্যের শক্তিকে গুরুত্ব দেয় এবং সযত্নে রক্ষা করে এই সম্পদ।

আরেকটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, কালে কালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নানামাত্রিক যুদ্ধ চলে এসেছে। কখনও সরাসরি কখনও বা পরোক্ষ ও স্নায়ুযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের উৎসও বিভিন্ন রকমের। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন যুদ্ধ হলো মতাদর্শে বিজয়ী হওয়ার যুদ্ধ। আজকের বিশ্ব পরম ক্ষুধাকাতর এক দানবে পরিণত হয়েছে। ফলে যে কোনো উপায়ে এই ক্ষুধা নিবারণের উগ্র বাসনায় লিপ্ত। আর এই উগ্রবাসনা পূরণ করতে পরিকল্পিতভাবে টার্গেটে পরিণত করা হয়েছে যৌবন ও তারুণ্যের উচ্ছলতাকে। এই কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে উদ্যম সংস্কৃতি ও অবাধ যৌনাচার। এই অস্ত্র ব্যবহার করে বিশ্বমোড়লরা অত্যন্ত কৌশল ও নিষ্ঠুর উপায়ে যৌবন ও তারুণ্যের পাগলাঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করে তাদেরকে অন্তসারশূন্য করে ময়লার ভাগাড়ে ফেলে দিচ্ছে। মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা, ভাবনায় ভরিয়ে দিয়েছে পরকালবিমুখতা, কানে তুলে দিয়েছে এফএমের ইয়ারফোন,

চোখে মাখিয়েছে হলিউড, বলিউড, টালিউড ও ঢালিউডের অশ্লীলতার রঙ। রসনায় লাগিয়েছে নেশার তরল পদার্থ আর চিন্তায় প্রবেশ করিয়েছে অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের অদম্য লিপ্সা। পশ্চিমা-হিন্দুস্তানীর নগ্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও অশ্লীলতায় আজকের তারুণ্য এক উদ্যমহীন, লাগামছাড়া ভোগসর্বস্ব চিন্তা নিয়ে বেড়ে উঠছে। এসব বস্তু তারুণ্যের মন থেকে শুধু পরকালচিন্তাই বিদায় করে দেয়নি বরং মানবকল্যাণে উৎসর্গিত হওয়ার অনুপ্রেরণাও ধ্বংস করে দিচ্ছে। একটি মুসলিম জাতির পতনের এরচেয়ে বড় কোনো কারণ থাকতে পারে না। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে, এদেশের ক্ষমতালোভী শাসকদের কাপুরুষোচিত সিদ্ধান্তের কারণে তরুণরা বিশেষ করে হিন্দুস্তানী নোংরা সাংস্কৃতির আগ্রাসনে অতি সহজেই শত্রুর শিকারে পরিণত হচ্ছে। তথাকথিত জাতির কর্ণধাররা তারুণ্যের এই উচ্ছল শক্তিকে তাদের স্বার্থে হীনকাজে প্রয়োগ করছে। তাদের দিকভ্রান্তিতে সোজা পথ না দেখিয়ে বরং আরো অন্ধকার পথে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অভাব নেই, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রবান ও নিখাঁদ দেশপ্রেমিকের অভাবের শেষ নেই। এই সমস্যার প্রধান কারণ, আমাদের তারুণ্যকে যথাযথ পরিচর্যা না করা এবং ধ্বংসোন্মুখ এই তারুণ্যকে হিন্দুস্তানী অশ্লীলতার থাবায় নিরস্ত্র অবস্থায় ফেলে রাখা। ফলে নিরস্ত্র ও পরকালীন ভাবনাহীন এই তারুণ্যের শৌর্যবীর্য আজ ক্ষয় হচ্ছে অশ্লীল কল্পনায়, পেপার-পত্রিকার হিন্দুস্তানী সিরিয়াল মেলানোর ভাবনায় এবং ভারতীয় নায়ক-নায়িকাদের স্ট্যাটাস পাঠ আর লাইক

দেয়ার নোংরামি ধান্ধায়। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে এফএম রেডিও, ইন্টারনেটসহ প্রযুক্তির অহর্নিশ অপব্যবহার। প্রযুক্তির এই যান্ত্রিকতা তারুণ্যের হৃদয় আঙিনাকে ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। আজ এফএম রেডিওগুলোতে প্রচার করা হচ্ছে কলগার্ল (পতিতাদের) সরাসরি সাক্ষাৎকার। প্রেম-ভালোবাসার গল্প বলার ছলে প্রেমিক-প্রেমিকাদের শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে এবং ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির কবর রচনা করে তারুণ্যের হৃদয় থেকে লজ্জা-শরম চিরবিদায় করে দিচ্ছে।

তারুণ্যের বড় শত্রু আজ চারটি বস্তু। মোবাইল ভিডিও, এফএম রেডিও, নেশাজাত দ্রব্য এবং তথাকথিত প্রেমভালোবাসা। প্রেম-ভালোবাসার নামে চলছে মূলত ভয়ানক ব্যভিচার এবং ধর্ষণ ও অপহরণ। বিশ্বের পণ্যের বিপুল চাহিদা সৃষ্টির জন্য এই চারটি বস্তুর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ফলে তারা সচতুরভাবে সামাজিক অবক্ষয়ের এই ভয়ানক উপকরণগুলো তরুণ ও যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। হলফ করেই বলা যায়, হিন্দুস্তানী বণিকরা তাদের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে এবং তরুণরা তাদের দেওয়া অবক্ষয়ের এই দাওয়াইগুলো প্রাণসঞ্জীবিনী মনে করে দেদারছে গিলছে। এর ফলে তারা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হারিয়ে সাংস্কৃতিকভাবে হিন্দুস্তান ও পাশ্চাত্যের দাসানুদাস জাতিতে পরিণত হচ্ছে। যৌবনের পাগলা ঘোড়া তাদেরকে যেদিকে টানছে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেদিকেই দৌড়াচ্ছে। অবক্ষয় তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, এর কারণে তারা স্বাধীন-সংস্কৃতি ও স্বকীয় তাহযীব-তামাদ্দুনের মূল্যায়ন করতে

পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। হতোদ্যম এই তারুণ্য হিন্দুস্তানী গানবাজনায় বিভোর। তাই তারা নিজ দেশের গান ও বিজয়ের নিশান ওড়ানোর সাহস দেখাতে পারছে না।

সুতরাং তারুণ্যের এই উদ্ভাবনীশক্তি ধরে রাখতে হলে অবশ্যই ইহুদি-খ্রিস্টান-পৌত্তলিক সংস্কৃতি ও অশ্লীলতার ছোবল থেকে তাদেরকে দূরে রাখতে হবে। বাঁচাতে হবে দেশের স্বাধীনতা। আমাদের এই মুসলিম দেশটির বিরুদ্ধে বিজাতির দাদাগিরি প্রতিহত করতে সর্বাগ্রে তাদের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। অন্যথায় আমাদের পরিণতি হতে পারে হায়দারাবাদের মতো, যে দেশটি স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও ভারত বিভিন্ন কলাকৌশলে দখল করে নেয় এবং এভাবে পৌত্তলিকদের ষড়যন্ত্রে বিশ্বমানচিত্র থেকে হারিয়ে যায় একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের পতাকা। যে দেশের তারুণ্যের শক্তি উদ্যমহীন হয়ে পড়ে, অপসংস্কৃতির কাদা-পানিতে মিশে যায় সেই দেশের স্বাধীনতা-স্বকীয়তা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই শুধু পরকালের স্বার্থেই নয়, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়তে হবে নিজেদের ও দেশেরই স্বার্থে।

নমরুদ-নরকে পুড়ছে হিজাব: ফুঁৎকার দিচ্ছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়!

নমরুদ মরলেও তার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-নরক আজও নেভেনি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে নমরুদের প্রেতাত্মারা কখনও ইসলামের বিরুদ্ধে, কখনও ইসলামের আদর্শের বিরুদ্ধে এবং কখনও ইসলামী তাহযীব-

তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে নমরুদীয় অগ্নিনরক প্রজ্জ্বলন করেছে এবং এখনও করে চলেছে। নমরুদের আবির্ভাব কেবলই দেহকেন্দ্রিক নয়; কখনও কখনও আদর্শকেন্দ্রিকও।

বিশ্বের আনাচে কানাচে হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে হিজাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ। কেউ আর এখন রাখঢাক করছে না হিজাবের বিরোধিতায়। এ কাজে এগিয়ে আছে তথাকথিত সভ্যতার দাবিদার ইউরোপবিশ্ব। ইউরোপে ফ্রান্সের পর হল্যান্ডেও বোরকা পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। হল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতি দিয়ে বলছে- বোরকা, নেকাব বা হিজাব এবং চেহারা আবৃত রাখে এমন সব পোশাক পরিধানে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। হল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিক্সিন আমস্টার্ডমে মিডিয়াকে বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা কেবল বোরকা বা অন্যান্য ইসলামী পোশাকের ওপরই নয়; বরং চেহারা আবৃত করার সব পোশাকের ওপর বলবৎ করা হবে। উল্লেখ্য, হল্যান্ডের সতের মিলিয়ন নাগরিকের মধ্যে এক মিলিয়ন নাগরিক মুসলিম।

ফ্রান্সের সংসদের নিম্নকক্ষ জুলাই ২০১০ ঈসায়ীতে হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিল অনুমোদন করেছিল। অতপর ২০১১ সালের এপ্রিলে পার্লামেন্টে পাশ হওয়া আইনের অধীনে মুসলিম নারীদের পুরোপুরি হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। স্মর্তব্য যে, ফ্রান্স নেকাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম সদস্য রাষ্ট্র। সুতরাং এখন ফ্রান্সে সাধারণ স্থানসমূহে নেকাব আবৃত যে কোনো মুসলিম নারীকে জরিমানা এবং কারাবাসের সাজার মুখে

পড়তে হয়। ফ্রান্সের সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রস্তুত এই আইনের আওতায় রাষ্ট্রের সকল স্কুল, হসপিটাল, সরকারি পরিবহন এবং সরকারি দপ্তরসমূহে মুসলিম নারীদের সম্পূর্ণ হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর রয়েছে। এ জায়গাগুলোয় হিজাব পরলে ১৫০ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা আদায় করা হয়। উপরন্তু যেসব পুরুষ নিজেদের স্ত্রী, কন্যা বা বোনদের হিজাব পরতে বাধ্য করবেন এবং যে আলেমগণ এর প্রচার করবেন তাদেরকে ত্রিশ হাজার ইউরো পর্যন্ত জরিমানা বা এক বছর কারাবাসের শাস্তি প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সে বাস করে ইউরোপের মুসলিমদের সবচেয়ে বড় কমিউনিটি। এখানে স্থানীয় ও অভিবাসী মিলিয়ে মুসলিমের সংখ্যা ষাট লাখের অধিক। ফ্রান্সের মুসলিমদের ভাষ্য মতে, এই আইন কার্যকর হওয়ায় ফ্রান্সের অন্য বড় ধর্মাবলম্বীগণ তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করেছেন। দেশে ইসলামোফোবিয়ার ঝুঁকি আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম ও তাদের মসজিদগুলো ধারাবাহিক ঘৃণার টার্গেটে পরিণত হচ্ছে। প্রকাশ থাকে, ফ্রান্সের পথ ধরে বেলজিয়াম ও অস্ট্রেলিয়াও মুসলিম নারীদের নেকাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

ইউরোপে বোরকা ও হিজাবের বিরুদ্ধে যদিও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে; কিন্তু ওখানকার জ্ঞানী-গুণী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এই নিষেধাজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইউরোপের মানবাধিকার কাউন্সিলের কমিশনার থমাস

হামবুর্গ এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এ ধরনের পদক্ষেপের কারণে নারীদের স্বাধীনতা দেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে সামাজিক জীবন থেকেই বের করে দেওয়া হচ্ছে। বস্তুত বোরকার ওপর নিষেধাজ্ঞা ইউরোপের মানবাধিকারের মানদণ্ড এবং বিশেষত কারো ঘরোয়া জীবন ও ব্যক্তি পরিচয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেতনা পরিপন্থী। মুসলিম নারীদের পোশাকের ব্যাপারটিকে যেভাবে সমালোচনার লক্ষ্য বানানো হচ্ছে, তা থেকে হাত গুটাতে হলে আলাপ-আলোচনা ও আইন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।’

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যে সমাজে পর্দাকে সামাজিক সম্পর্কের জন্য অন্তরায় আখ্যায়িত করে সমালোচনার লক্ষ্য বানানো হচ্ছে, সেখানকার নারীদের মধ্যে হিজাবের জনপ্রিয়তা কেবল বেড়েই চলেছে। কয়েকজন অমুসলিম নারী ইসলামের পোশাক ধারণ করে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তারা নিজেদেরকে এ বাস্তবতা স্বীকারে নৈতিকভাবে বাধ্য মনে করেছেন যে, আদতেই নারীরা হিজাব ও পর্দার ভেতরে সম্মানবোধ করেন। ‘নাউমি ওয়াল্ফ’ আমেরিকার এক খ্রিস্টান নারী। নারী স্বাধীনতা এবং সমাজে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি কাজ করে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি দুটো বইও রচনা করেছেন। নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির নারীদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নে তার বিশেষ আগ্রহ। হিজাবকেন্দ্রিক সমালোচনা সূত্রে একটি মুসলিম দেশে মুসলিম পোশাক পরার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি। উদ্দেশ্য, এ পোশাকে খোদ নারীরা কেমন বোধ করেন তা জানা।

তার ভাষ্য ছিল, ‘আমি মারাকেশে নিজের থাকার জায়গা থেকে যখন বাজারে যাবার জন্য বের হলাম, তখন আমি সেলোয়ার-কামিজ পরেছিলাম। আমার মাথা ছিল স্কার্ফে ঢাকা। মারাকেশের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সবখানে একে সম্মান দেখানো হয়। আর আমি যেহেতু তাদের স্বদেশী কেউ নই, তাই তাদের দৃষ্টিতে কিছুটা দ্বিধা ও সংশয় থাকবে বৈ কি। কিন্তু সন্দেহের কিছু দৃষ্টির কথা বাদ দিলে আমাকে উদ্বিগ্ন করার মতো কোনো কিছু নজরে আসে নি। আমি নেহাত আরামে ছিলাম। কোনো চিন্তার বিষয় ছিল না। আমি সবদিক থেকে নিজেকে নিরাপদ এবং স্বাধীন বোধ করেছি।’

‘মুসলিম নারী : পর্দা এবং জেন্ডার ইস্যু’ শীর্ষক নিজের এর্টিকেলে ‘নাউমি ওয়াল্ফ’ পশ্চিমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, ‘মুসলিম মূল্যবোধকে নিষ্ঠার সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করুন। পর্দার উদ্দেশ্য কখনোই নারীকে দমিয়ে রাখা নয়। এটি বরং ‘প্রাইভেটের মোকাবেলায় পাবলিকের’ বিষয়। পাশ্চাত্য বিশ্ব নারীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে এক অর্থে বাজারের পণ্য বানিয়ে ছেড়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম নারীর সৌন্দর্য ও তার সত্তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে তাকে এক পুরুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। যে পুরুষের সঙ্গে ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসারে তিনি পুরো জীবন কাটিয়ে দেবেন বলে স্থির করেছেন।

কিছুদিন আগে আমেরিকার হিস্প্যানিক বংশোদ্ভুত এক নওমুসলিম নারী লিখেন, ‘আমি যখন পাশ্চাত্যের পোশাকে ছিলাম তখন আমাকে নিজের চেয়ে অন্যের রুচির প্রতিই বেশি লক্ষ্য রাখতে হতো। ঘর

থেকে বেরুবার আগে নিজেকে দেখতে কেমন লাগছে তা নিশ্চিত হওয়া এক অপ্রিয় ও বিরক্তিকর ব্যাপার ছিল। তারপর আমি যখন কোনো স্টোর, রেস্টুরেন্ট বা জনসমাগম স্থানে যেতাম তখন নিজেকে অন্যদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় অনুভব করতাম। দৃশ্যতঃ আমি যদিও নিজে স্বাধীন ও নিজ সিদ্ধান্তের মালিক ছিলাম কিন্তু বাস্তবে আমি ছিলাম অন্যের পছন্দ-অপছন্দের জালে বন্দি। তাছাড়া এ চিন্তাও মাথায় থাকত যে, যতদিন আমার রূপ-লাবণ্য ও বয়স অটুট থাকবে মানুষ আমার পেছনে ঘুরবে; কিন্তু বয়স গড়ানোর পর নিজেকে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হলে আমাকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে। পক্ষান্তরে ইসলাম আমাকে এখন ওসব উটকো ঝামেলা থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত ও স্বাধীন বানিয়ে দিয়েছে।’

অতিসম্প্রতি হলিউডের প্রখ্যাত চিত্রনির্মাতা লিয়াম নিসন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন। ঊনষাট বছর বয়েসী এই পরিচালক ক্যাথলিক খ্রিস্টান ছিলেন। বিদেশি পত্রিকা মারফত জানা যায়, লিয়াম নিসন জানান, তুরস্কে সিনেমার চিত্র ধারণ করতে গিয়ে সেখানকার মুসলিমের ইবাদতের ধরনে তিনি প্রভাবিত হন। এর মধ্যে তিনি আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন। তিনি আরও বলেন, মসজিদগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক। এসবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ ইসলামের আরও কাছে চলে আসে।

ভাববার বিষয় হলো, পাশ্চাত্য কি এখন নিজের দিগম্বর সভ্যতা ও মাতা-পিতাহীন সংস্কৃতির বদৌলতে ধ্বংস ও পতনের অতি কাছে চলে গিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য একটি খবরের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট

হতে পারে। এতে বলা হয়েছে, পাঁচ কোটি মার্কিনি নানাধরনের মানসিক রোগে ভুগছে। প্রতি পাঁচজনের একজন আমেরিকান পরিপূর্ণ মানসিক রোগী হয়ে গেছেন। পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি জটিল মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত। শতকরা ২৩ ভাগ নারীর মোকাবেলায় শতকরা ১৬.৮ ভাগ পুরুষ এই উপসর্গের শিকার। পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের তুলনায় ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়েসী যুবকদের মধ্যে এই রোগের বিস্তার দ্বিগুণ। রিপোর্টে এ কথাও বলা হয় যে, এক কোটি ১৪ লাখ মার্কিনির মধ্যে জটিল কিসিমের মস্তিষ্কের রোগ পাওয়া যায়। ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী ১৯ লাখ তরুণ আমেরিকান ডিপ্রেশনের শিকার।

প্রকৃতপক্ষে তাগুতী শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে গ্রহণ করা ইসলামবিরোধী পদক্ষেপগুলো পাশ্চাত্যে দ্রুত বর্ধিষ্ণু ইসলামের জনপ্রিয়তার পথ রুদ্ধ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। কারণ, গত এক দশকে যেভাবে পাশ্চাত্যে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়েছে তাতে জায়নবাদী কর্মকর্তাদের চোখের ঘুম হারাম হবার যোগাড়। শুধু আমেরিকাতেই প্রতি বছর ২০ হাজার ব্যক্তি ইসলামে দাখিল হচ্ছেন। এ পর্যন্ত যেই সভ্যতা-সংস্কৃতি বস্তুপূজা ও আল্লাহকে রুষ্ট করার পোশাকে উপস্থাপন করা হয়েছে আজ তা ঘুণে ধরা কাঠের মতো দৃশ্য তুলে ধরছে। গতকালও যে কালচার ও সভ্যতাকে উপমা বা আদর্শ বলা হচ্ছিল আজ তা থেকেই ছুটে পালানোর ঘোষণা আসছে। পাশ্চাত্যে দিনদিন ইসলামের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ইসলামের সত্যতা এবং ইসলামের নবীর বস্তুনিষ্ঠতার সবচে বড় প্রমাণ।

বিশ্বের বিভিন্ন অমুসলিম প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোতে আমাদের মুসলিম যুবতীরা হিজাবের মাহাত্ম্যকে হিমালয় সদৃশ উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার নিরন্তন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। শুক্রবার, ২৩ আগস্ট ২০১৩ ইং বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ বেরুলো- 'বোরকা খোলার আদেশ প্রত্যাখ্যান'। সংবাদে প্রকাশ : বোরকা খুলে আদালতে প্রবেশ করতে বিচারকের দেওয়া আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন লন্ডনের এক মুসলিম তরুণী। লন্ডনের একটি আদালতের বিচারক পিটার মারফি উন্মুক্ত বিচারের শর্তের কথা উল্লেখ করে তাকে বোরকা খোলার নির্দেশ দেন। কিন্তু ২১ বছর বয়সী বিবাদী ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে পুরুষদের সামনে বোরকা খুলতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, এটা আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী।' [সূত্র : মেইল অনলাইন]

এই সাহসী মুসলিম তরুণী বাতিলের সামনে ইসলামের একটি গৌরবময় বিধানের মর্যাদা ও তাতে মুসলিম নারীদের অবিচলতার কথা তুলে ধরার বদৌলতে তিনি আবু জেহেলের সামনে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হকের ওপর অবিচল থাকার মর্যাদার কাছাকাছি মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। কারণ, এমন এক সংকট মুহূর্তে একজন সাহসী নারীর এগিয়ে আসা নিঃসন্দেহে সারাবিশ্বের অমুসলিম তাগুতি শক্তি হিজাবের প্রতি সমীহ করতে বাধ্য হবে। [আলী হাসান তৈয়ব লিখিত পর্দাবিষয়ক ইসলাম হাউজের একটি লেখা অবলম্বনে]

সুইডেনে হিজাব পরে মুসলিম নারীর প্রতি সংহতি প্রকাশ

ফ্রান্সে এক মুসলিম মহিলার ওপর বর্ণবাদী হামলার প্রতিবাদে অভিনব হিজাব কর্মসূচি শুরু করেছেন সুইডেনের নারীরা। ফেসবুক, টুইটারসহ নানা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের হিজাব পরিহিত ছবি আপলোড করতে শুরু করেছেন সুইডেনের নারীরা।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উপকণ্ঠে হিজাবধারী এক নারীর ওপর হামলা চালায় কিছু উগ্রবাদী। হামলাকারীরা ওই নারীর হিজাব ছিঁড়ে ফেলে এবং তার মাথা গাড়িতে ঠুকে দেয়। একপর্যায়ে রডকাটার ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ওপর হামলা চালায় এবং মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর ঘটনাস্থলে একটি গাড়ি এসে পৌঁছলে পালিয়ে যায় উগ্রবাদীরা। [সূত্র : আল জাজিরা : ২১ আগস্ট ২০১৩ ইং]

মুসলিম নারীর প্রতি সংহতি প্রকাশ করে অভিনব এই সামাজিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন নানা ধর্মের নারীসহ রাজনীতিবিদ এবং টিভি উপস্থাপিকারা। রাজনীতিবিদ আসা রোমসোন, ভেরোনিকা পাম এবং টিভি উপস্থাপিকা গিনা দিরাউই এরইমধ্যে ফেসবুক, টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোতে হিজাব পরিহিত ছবি আপলোড করেছেন।

হিজাবের অনুমতি পেল কানাডার মুসলিম মহিলা পুলিশ কর্মকর্তারা :

কানাডার অ্যাডামুন্তন সিটির মুসলিম মহিলা পুলিশ কর্মকর্তাদের ইসলামী শালীন পোশাক বা হিজাব পরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে তারা হিজাব পরে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

Onislam.net ওয়েব সাইটের উদ্ধৃতি দিয়ে কুরআন বিষয়ক আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা 'ইকনা' জানিয়েছে, এর আগে কানাডার এই শহরের পুলিশ কর্তৃপক্ষ পুলিশ বিভাগে কাজ করতে মুসলিম মহিলাদের উৎসাহিত করার জন্য মুসলিম পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে হিজাব ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেছিল।

হিজাব ব্যবহারের বিষয়টা অনুমোদন লাভের পর এখন থেকে যে কোনো মুসলিম নারী কোনো রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছাড়াই ইসলামী শালীন পোশাক পরে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করতে পারবেন। অ্যাডামুন্তন সিটির মুসলিম নারী পরিষদের প্রধান সারিয়া যাকি হাফেজ বলেছেন, পুলিশ বিভাগে মুসলিম নারী সদস্যদের হিজাব ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার পর মুসলিম নারীরা কানাডার সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম নারীদের হিজাব ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কানাডার অ্যাডামুন্তন সিটির পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অনেক যাচাই বাছাই করে দেখার পর এটা প্রমাণিত হয়েছে, হিজাব ব্যবহারের কারণে মুসলিম নারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে কোনো সমস্যা হবে না এবং কাজেও ব্যাঘাত ঘটবে না।

কানাডার মোট জনসংখ্যা তিন কোটি ৩০ লাখ এবং এর মধ্যে প্রায় তিন শতাংশ হচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠী। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পর মুসলিমরাই সেখানে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়।

পর্দা আলো ছড়াচ্ছে বিশ্বাসের আঙিনায়

পর্দার বিরুদ্ধে অব্যাহত বিদ্বেষ-লড়াই সত্ত্বেও পর্দা ও হিজাব তার স্বচ্ছ-পবিত্র কারিশমার বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। পর্দার শুদ্ধতা আলোকিত করছে ভ্রান্তপথিকের বিশ্বাসের আঙিনা। এক মার্কিন অধ্যাপকের ইসলাম গ্রহণের গল্প তুলে ধরতে চাই। জানেন তার ইসলাম গ্রহণের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? হ্যাঁ, তার ইসলাম গ্রণের প্রথম ও একমাত্র কারণ ছিল এক মার্কিন তরুণীর হিজাব। যিনি তার হিজাব নিয়ে সম্মানবোধ করেন। নিজ ধর্ম নিয়ে গর্ব করেন। শুধু একজন অধ্যাপকই ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের মধ্যে তিন ডক্টর ও চার ছাত্রীও ইসলামধর্মে অন্তর্ভুক্ত হন। এ সাতজন ব্যক্তিই অভিন্ন সেই হিজাবকে কেন্দ্র করেই ইসলামে দীক্ষিত হন। গল্পটি তবে সেই মার্কিন ডক্টরের ভাষ্যেই পড়ুন।

নিজের ইসলামে প্রবেশের গল্প শোনাতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ আকুয়া বলেন, বছর চারেক আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সহসা এক বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এখানে পড়তে আসে এক মুসলিম তরুণী। নিয়মিত সে হিজাব পরিধান করে। ওর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন একজন কট্টর ইসলামবিদ্বেষী। যে কেউ তার সঙ্গে বিতর্ক এড়াতে চাইলেও তিনি গায়ে পড়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করতেন। আর

এমন অনুশীলনরত মুসলিম পেলে তো কথাই নেই। স্বভাবতই তিনি মেয়েটিকে যে কোনো সুযোগ পেলেই উত্যক্ত করতে লাগলেন।

একপর্যায়ে মেয়েটির ওপর একের পর এক কল্পনাশ্রয়ী আক্রমণ করতে লাগলেন। মেয়েটি যখন শান্তভাবে এসবের মোকাবেলা করে যেতে লাগল, তার রাগ আরও বৃদ্ধি পেল। এবার তিনি অন্যভাবে মেয়েটিকে আক্রমণ করতে লাগলেন। তার এডুকেশন গ্রেড বৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করলেন। তাকে কঠিন ও জটিল সব বিষয়ে গবেষণার দায়িত্ব দিলেন। কড়াকড়ি শুরু করে দিলেন তাকে নাম্বার দেওয়ার ক্ষেত্রে। এরপরও যখন অহিংস পদ্ধতিতে মেয়েটিকে কোনো সমস্যায় ফেলতে পারলেন না, চ্যান্সেলরের কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ দায়ের করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল, ছাত্রী ও অধ্যাপক উভয়কে একটি বৈঠকে ডাকা হবে। উভয়ের বক্তব্য শোনা হবে। সুষ্ঠু তদন্ত করা হবে মেয়েটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের।

নির্দিষ্ট দিন এলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির সব সদস্য উপস্থিত হলেন। আমরা সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে এ পর্বটির জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের মোকাদ্দমা এই প্রথম। বৈঠক শুরু হল। প্রথমে ছাত্রীটি অভিযোগ করল, অধ্যাপক সাহেব তার ধর্মকে সহ্য করতে পারেন না। এ জন্য তিনি তার শিক্ষার অধিকার হরণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সে তার অভিযোগের সপক্ষে কয়েকটি দৃষ্টান্তও তুলে ধরল এবং এ ব্যাপারে তার সহপাঠীদের বক্তব্যও শোনার দাবি জানাল। সহপাঠীদের অনেকেই

ছিল তার প্রতি অনুরক্ত। তারা তার পক্ষে সাক্ষী দিল। বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্য দিতে ধর্মের ভিন্নতা তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না।

মেয়েটির জোরালো বক্তব্যের পর ডক্টর সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। অব্যাহতভাবে কথাও বলে গেলেন; কিন্তু মেয়েটির ধর্মকে গালি দেওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। অথচ মেয়েটি দিব্যি ইসলামের পক্ষে তার বক্তব্য উপস্থাপন করল। ইসলাম সম্পর্কে অনেক তথ্য ও সত্য তুলে ধরল। তার কথার মধ্যে ছিল আমাদের সম্মোহিত করার মত অলৌকিক শক্তি। আমরা তার সঙ্গে বাক্যবিনিময়ে প্রলুব্ধ না হয়ে পারলাম না। আমরা ইসলাম সম্পর্কে আপন জিজ্ঞাসাগুলো তুলে ধরতে লাগলাম আর সে তার সাবলীল জবাব দিয়ে যেতে লাগল। ডক্টর যখন দেখলেন আমরা অভিনিবেশসহ মেয়েটির যুক্তিতর্ক শুনছি, তার সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়েছি, তখন তিনি হল থেকে নিরবে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটিকে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া এবং সাগ্রহে তার বক্তব্য শোনা দেখে তিনি কিছুটা মর্মাহত হলেন বৈকি। একপর্যায়ে তিনি এবং তার মতো যাদের কাছে মেয়েটির আলোচনা গুরুত্বহীন মনে হচ্ছিল তারা সবাই বিদায় নিলেন। রয়ে গেলাম আমরা, যারা তার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করছিলাম। তার বাক্যমাধুর্যে অভিভূত হচ্ছিলাম। কথা শেষ করে মেয়েটি আমাদের মধ্যে এক টুকরো কাগজ বিতরণ করতে লাগল। 'ইসলাম আমাকে কী বলে' শিরোনামে সে তার চিরকুটে ইসলাম গ্রহণের কারণগুলো তুলে ধরেছে। আলোকপাত করেছে হিজাবের মাহাত্ম্য ও উপকারিতার ওপর। যে হিজাব নিয়ে এই

সাতকাহন এর ব্যাপারে তার পবিত্র অনুভূতিও ব্যক্ত করেছে সেখানে।

বৈঠকটি অমিমাংসিতভাবেই সমাপ্ত হল। মেয়েটির অবস্থান ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। যে কোনো মূল্যে নিজের অধিকার রক্ষা করবে বলে সে প্রত্যয় ব্যক্ত করল। প্রয়োজনে আদালত পর্যন্ত যাবে সে। এমনকি তার পড়ালেখা পিছিয়ে গেলেও সে এ থেকে পিছপা হবে না। আমরা শিক্ষা কমিটির সদস্যরা কল্পনাও করি নি মেয়েটি তার ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এমন অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেবে। কতজনকেই তো এতগুলো শিক্ষকের সামনে এসে চুপসে যেতে দেখলাম। যা হোক, ঘটনার পর থেকে এ নিয়ে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে বিতর্ক চলতে থাকল।

কিন্তু আমি কেন জানি নিজের ভেতর হিজাবের এই ধর্ম নিয়ে প্রবল আলোড়ন অনুভব করলাম। এ ব্যাপারে অনেকের সঙ্গেই কথা বললাম। তারা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করল। কেউ কেউ উৎসাহ যোগাল ইসলামে দীক্ষিত হতে। এর ক’মাস বাদেই আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম। ক’দিন পর দু’জন অধ্যাপক আমাকে অনুসরণ করলেন। এবং সে বছরই আরও একজন ডক্টর ইসলাম গ্রহণ করলেন। আমাদের পথ ধরে চারজন ছাত্রও ইসলামে দাখিল হলো। এভাবে অল্পকালের মধ্যেই আমরা একটি দল হয়ে গেলাম- আজ যাদের জীবনের মিশনই হলো, ইসলাম সম্পর্কে জানা এবং মানুষকে এর প্রতি আহ্বান জানানো। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকেই ইসলাম কবুলের ব্যাপারে সক্রিয় চিন্তা-

ভাবনা করছেন। ইনশাআল্লাহ অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ শুনতে পারবে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। [ইসলাম হাউজে প্রকাশিত আলী হাসান তৈয়ব লিখিত 'মুসলিম তরুণীকে দেখে তিন মার্কিন অধ্যাপকের ইসলাম গ্রহণ' শীর্ষক লেখা থেকে]

কিন্তু ওরা এত স্পর্ধা পায় কোথায়?

বিশ্বের বিধর্মী রাষ্ট্রগুলোর হিজাবের বিরুদ্ধে যখন খোদ সেদেশেই তীব্র সমালোচনা হচ্ছে এবং বিধর্মী রমণীগণ হিজাবের মাহাত্ম্য অনুধাবন করে দলে দলে মুসলিম হচ্ছেন ঠিক তখনই বাংলাদেশের মতো একটা হাজার বছরের ইসলামী ঐতিহ্য ও পর্দার বিধান ধারণকারী রমণীদের ঘাড়ে এনজিও সংস্থা ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত ব্রাক ইউনিভার্সিটিতে পর্দা করার অপরাধে (?) ছাত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে!

হিজাব পরার কারণে রাজধানীর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হতে হয়েছে এক ছাত্রীকে। ১২ সেপ্টেম্বর '১৩ইং ইউনিভার্সিটির হাফসা ইসলাম নামে ইংরেজি বিভাগের স্নাতকের (সম্মান) ৭ম সেমিস্টারের এক ছাত্রীকে হিজাব পরায় ড্রেসকোড ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়। এর আগে গত ২২শে জানুয়ারি ড্রেস কোড ও নিরাপত্তার অজুহাতে ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এরপরও যেসকল ছাত্রী হিজাব পরিধান করত

তাদেরকে শোকজ করা হয়। শোকজ করার পরও হিজাব পরা অব্যাহত রাখায় গত ১২ সেপ্টেম্বর হাফসাকে বহিষ্কার করা হয়। সনাক্তকরণ সমস্যা ও নিরাপত্তা ঝুঁকিকে হিজাব নিষিদ্ধের পক্ষে যুক্তি হিসেবে দেখিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

অথচ এটা কোনো অজুহাতই নয়। কেননা, ইউনিভার্সিটির প্রবেশপথে স্ক্যানার লাগিয়ে নাশকতামূলক তৎপরতা রোধ করা সম্ভব, তাহলে কেউ এগুলো বহন করে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করতে পারবে না, এতে করে নিরাপত্তা বজায় থাকবে। সেই সঙ্গে আংগুলের ছাপে খুলে এমন অটোমেটিক লক প্রতিটি ক্লাশ রুমের দরজায় লাগানো হলে সনাক্তকরণ সহজসাধ্য হবে। শরীয়তের বিধান মোতাবেক হিজাব পরিধান করা মুসলিম মহিলাদের জন্য ফরজ। সেই ফরজ বিধান পালনের অপরাধে (?) একটা এনজিও সংস্থার অধীনে পরিচালিত ভার্সিটি মুসলিম নারীদের বহিষ্কারের ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস পায় কোথা থেকে?

এই দুঃসাহসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে তৌহিদী জনতা। কিন্তু তৌহিদী জনতার এই আন্দোলনে প্রথম প্রথম অবজ্ঞা করে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়। অনড় থাকার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষ বলে, আমরা ড্রেসকোড সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছি। ওই শিক্ষার্থী ড্রেসকোড মানলেই কেবল তাকে অনুমোদন দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইসফাক ইলাহী চৌধুরী বলেন, হাফসার পরিবারকে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। হাফসার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে শিথিলও করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা বৈঠকে উপস্থিত

হননি। তারা এখন বলছে ড্রেসকোড পরিবর্তন করতে হবে। এটা বোর্ড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্ত। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অনড়। বিষয়টা এখন আইনীভাবেই মোকাবেলা করা হবে।

হাফসার বড় ভাই আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইসা বলেন, হাফসাকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে সেখানে বোর্ড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে। এখন তারা মৌখিকভাবে কিছু শর্ত শিথিলের কথা বলছে। আমাদের কথা হচ্ছে ওই ড্রেসকোডই পরিবর্তন করতে হবে। আর যেহেতু লিখিতভাবে হাফসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাই লিখিতভাবেই প্রত্যাহার করতে হবে। আর সেটা বোর্ড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতে হবে। কেননা মৌখিকভাবে করা হলে কয়েকদিন পর আবার যে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

তিনি বলেন, বিষয়টা সমাধান না হলে আমরা তা আইনীভাবে মোকাবেলা করবো। ইংরেজি বিভাগের স্নাতকের (সম্মান) ৭ম সেমিস্টারের ছাত্রী হাফসা ইসলাম বলেন, বোরকার সঙ্গে নেকাব পরিধান করায় গত দুই সেমিস্টার ধরে আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। এভাবে আরও বেশ কয়েকজন ছাত্রীকে বোরকা ও নেকাব ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। জানুয়ারিতে নোটিশ জারির পরই এধরনের কড়াকড়ি শুরু হয় বলে জানান হাফসা ইসলাম। ওই ছাত্রীর আইডি নম্বর ১১৩০৩০০১। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ড্রেসকোডের দোহাই দিলেও গত ২২শে জানুয়ারি একটি নোটিশ জারি করে ড্রেসকোড ও নিরাপত্তার অজুহাতে ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের

বোরকা, নেকাব ও হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এরপরও যেসব ছাত্রী বোরকা, হিজাব ও নেকাব পরিধান করতেন তাদের ২৮শে মে শোকজ করা হয়। হাফসাকেও একই দিনে শোকজ করা হয়। ৩রা জুনের মধ্যে হাফসার কাছ থেকে জবাব চাওয়া হয়। হাফসা জবাব দিলেও তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দ মতো হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এই যে বিশ্বব্যাপী হিজাবের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে এবং এই লড়াইয়ে প্রতিবাদী নারীদের ব্যাপক প্রতিরোধ ও নতুন করে বিভিন্নধর্মের নারীদের হিজাবে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করায় তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজিতও হচ্ছে। হিজাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজদের যখন এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা, তখন বাংলাদেশের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিমরাষ্ট্র ও পর্দাপ্রিয় মুসলিম নারীদেরকে পর্দার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার ধৃষ্টতা বড় গভীর কোনো ষড়যন্ত্রের প্রতি দিকনির্দেশ করে নাকি?

বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম ও সচেতন তৌহিদী জনতা সেই এনজিও সংস্থাগুলোর পদযাত্রার প্রথমদিন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার এবং তাদের দূরভিসন্ধির কথা বলে আসছেন। কেউ এটাকে বাড়াবাড়ি কিংবা অহেতুক আশঙ্কা বলেও উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে সুবিধাবাদী চক্র এটাকে উলামায়ে কেরামের প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে সমালোচনা করেছে। কিন্তু সময়ের আবর্তনে উলামায়ে কেরামের সেই সন্দেহ-সংশয় বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে। নইলে কীভাবে সম্ভব বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিমদেশের মসজিদের

নগরী ঢাকায় বসে একজন মুসলিম নারীকে পর্দা পালনের অপরাধে ভার্সিটি থেকে বের করে দেয়া? দেশটাকে আমরা এনজিওদের হাতে ইজারা দিয়েছি? কিংবা ইসলামবিদ্বেষী চক্রকে দেশটাকে পুতুলের মতো নাচানোর অনুমতি প্রদান করেছি? এদের সর্বনাশা চক্রান্ত থেকে মুসলিমদেরকে আজই সোচ্চার হতে হবে, বিশেষ করে নারীসমাজকে। অন্যথায় এই চক্র ভবিষ্যতে নারীসমাজের জন্য আরো ভয়ানক চক্রান্ত নিয়ে হাজির হবে। আজ সতর্ক না হলে সে সময় হয়ত ইচ্ছা থাকলেও হয়ত প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না।

একাধিক বিয়ের আবেদন, চার বোনের আত্মহত্যা ও প্রাসঙ্গিক কথা

বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে অথচ বিয়ে না হওয়ায় 'আইবুড়ি'র অপমান সহ্য করতে হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে একসঙ্গে পাঁচ বোন আত্মহত্যা করতে নদীতে ঝাঁপ দেন। এর মধ্যে চারজনই মারা যান। সবচেয়ে ছোট বোনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। এদের সবার বয়স যথাক্রমে ৪৫, ৪৩, ৩৮, ৩৫ ও ৩১ বছর। ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মাইলসি নামের এক শহরে। পাকিস্তানের দ্য নেশন এ খবর জানিয়েছে।

এক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা জানান, বশির আহমেদ রাজপুত নামে এক গরিব বাবা যৌতুক জোগাড় করতে না পারায় পাঁচ মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার তার সঙ্গে মেয়েদের কথা কাটাকাটি হয়। পরে পাঁচ মেয়ে একসঙ্গে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে

পড়ে। এদের মধ্যে মাত্র একজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। [অনলাইন ডেস্ক : ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩]

ডিম থেকে বাচ্চারা যেমন খাদ্য বাসনা নিয়ে জন্মায় ঠিক ততটাই যেন মায়ের গর্ভ থেকে একজন নারীও মাতৃত্বের তৃষ্ণা নিয়ে জন্মায়। এ কারণে একজন নারীর সার্বক্ষণিক কল্পনা থাকে একটা সুন্দর ও পরিপাটি সংসার, মাতৃত্বের শ্বাশ্বত বাসনা। নারীরা সবচেয়ে বেশি আপ্লুত হয় মাতৃত্বকেন্দ্রিক এই ভাবনা নিয়ে, সবচেয়ে বেশি আহতও হয় ঠিক একই ভাবনার বিচ্ছেদ ঘটায়। নারীজীবনের সবচেয়ে বড় হতাশা হচ্ছে মাতৃত্বের সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুরূহ বোঝা। এই বোঝা যখন কোনো নারীকে ন্যুব্জ করে তখন তার স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পায় এবং জীবননাশী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। সম্ভবত একারণেই পাকিস্তানের এই পাঁচবোন কঠিন এই পথে পা বাড়িয়েছেন। সত্যিকার অর্থে একসঙ্গে এই পাঁচবোনের আত্মহত্যার ঘটনা মানবসভ্যতার জন্য এক নিষ্ঠুর ইতিহাস বৈ কি?

একটা সমাজ কতটা সর্বগ্রাসী যৌতুক লোভী হলে একটা পরিবারের পাঁচ পাঁচটা মেয়ে সদস্যকে আইবুড়ির অপবাদ মাথায় এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা কল্পনা করা যায়? কল্পনাশক্তির স্বল্পতা কিংবা বিবেচনাবোধের ঘাটতির কারণে আমরা অনেক তিক্ত সত্যকে মেনে নিতে পারি না, হজম করতে পারি না আল্লাহর বিধানের যৌক্তিকতাকে। এক্ষেত্রে ইসলামের একাধিক বিয়ের ভাবনা ও বিধান যদি সমাজে সাধারণ চোখে দেখা হতো তবে কি রচিত হতো এমন মর্মান্তিক ইতিহাস। সমাজের হাজার প্রগতিবাদী নারীর মায়াকান্নার

চেয়ে এই পাঁচবোনের জীবনকান্না কি ভারি নয়? নারী-আধিক্য ও নারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে যারা একাধিক বিয়েকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না তারা কি পেরেছে এই পাঁচবোনের দুঃখ ঘোচাতে? চোখের পানিতে এরা যখন ওড়না ভিজিয়েছে তখন কি কোনো প্রগতিবাদীরা এদের দুঃখের সান্ত্বনা হয়েছে?

অতিশয় স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী মানুষ কোন সাহসে ইসলামের বিধানের যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করে? যারা যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করে তারা পারে না কেন নারীর দুঃখ ঘোচাতে? 'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কী সে, কভু আশুবিষে দংশেনি যারে' কবির কথাটা বুঝি পরীক্ষার নাম্বার সংগ্রহ আর শ্রবণমাধুর্যের জন্য লিখিত হয়েছে? নারীজন্মের এই বেদনা কেবল ভুক্তভোগী নারীরাই উপলব্ধি করতে পারে এবং বাস্তবে দেখা গেলও তাই। পড়ুন নিচের রিপোর্টটি :

সৌদি কলেজ ছাত্রীদের আহ্বান : ৪ স্ত্রী রাখুন : সৌদি মেয়েদের চিরকুমারী থাকার সমস্যা কমানোর লক্ষ্যে দেশটির দাহরান অঞ্চলের একদল কলেজ ছাত্রী একই সময়ে কয়েকজন স্ত্রী রাখতে পুরুষদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে টুইটারে প্রচার অভিযান শুরু করেছে।

এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে চিরকুমারীত্ব রোধে প্রত্যেক পুরুষকে চার স্ত্রী রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। দেশটির দাহরান অঞ্চলের একদল কলেজ ছাত্রী টুইটার প্রচারণায় এ আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে এরই মধ্যে তারা টুইটাইরে প্রচার অভিযান জোরদার করেছেন।

তারা ইসলাম ধর্মের এ সংক্রান্ত বিধানের আলোকে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে আর্থিক ও শারীরিক দিক থেকে সক্ষম পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এ খবর জানিয়েছে।

গণমাধ্যম জানায়, সৌদি আরবে মেয়েদের চিরকুমারী থাকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশটিতে এ ধরণের নারীর সংখ্যা ২০১২ সালেই ১০ লাখে উন্নীত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে অনেকেই চিরকুমারীত্ব রোধে এ প্রচার অভিযানের প্রশংসা করলেও সৌদি আরবের বিবাহিত মহিলারা এর বিরোধিতা করেছেন।

অন্যদিকে সৌদি পুরুষরা বলছেন, তারা এক স্ত্রীকে রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ তাতে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একজন সৌদি পুরুষ বলেছেন, কেউ যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন যে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী উভয়ের সঙ্গেই ন্যায়বিচারপূর্ণ আচরণ করতে পারবেন কেবল তখনই তিনি এ ধরনের বিয়ের কথা ভাবতে পারেন।

সামিয়া আল দানদাশি নামের এক সৌদি নারী এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, প্রত্যেক সৌদি পুরুষ যদি চারজন স্ত্রী রাখেন এবং তার প্রত্যেক স্ত্রী যদি গড়ে আটজন সন্তান জন্ম দেন তাহলে নারীদের চিরকুমারিত্ব সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি এ দেশটির জনসংখ্যাও বেড়ে যাবে।

প্রসঙ্গত অর্থনৈতিক সংকট ও বিয়ের জন্য পুরুষদের অপ্রয়োজনীয় বিপুল অর্থসম্পদ মহর ও স্ত্রীর জন্য শ্বশুরপক্ষকে যৌতুক হিসেবে দেওয়ার ব্যয়বহুল প্রথা সৌদি মেয়েদের অবিবাহিত থাকার সবচেয়ে দুটি বড় কারণ। দেশটির অর্থনীতি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জরিপে দেখা গেছে, ২০১১ সালে সেখানে ৩০ বছর বয়সী অবিবাহিত নারীর সংখ্যা ছিল ১৫ লাখ ২৯ হাজার ৪১৮জন। [তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট ২৭ অক্টোবর ২০১৩ ইং ও ঢাকা রিপোর্ট টোয়েন্টিফোর]

পাঠক চিন্তা করুন, একটা দেশের লাখ লাখ বিবাহ উপযোগী নারী যদি কুমারী থেকে যায় তবে সেই দেশের নারীকুলের মর্যাদা থাকে কোথায়? মানুষ কি কাঠের পুতুল? নারী কি জৈবিকসত্তা নয়? বৈধ ও স্বাভাবিকপন্থায় তাদের জৈবিক চাহিদা নিবৃত করার অধিকার নেই? পুরুষ স্বল্পতার কারণে একটা দেশের লাখ লাখ নারী তার প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন? তাদেরকে বঞ্চিত রাখার অধিকার কে কাকে দিয়েছে? শুধুই কি জৈবিক চাহিদা? সমাজ-সংসার, স্বামী-সন্তান ও স্বাভাবিক জীবনের অধিকার থেকেই কি তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? শুধু অধিকার বঞ্চিতের কথা কেন বলি, এই কারণে কি পৃথিবী জুড়ে মানবিক ও চারিত্রিক অধপতনের ডঙ্কা বেজে উঠবে না?

সৌদি আরবে না হয় এখনো ইসলামী আইন কার্যকর থাকায় অনেক অপ্রীতিকর অবস্থা ও যিনা-ব্যভিচারের রাশ টেনে রাখা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু যেসব দেশে ইসলামী আইন চালু নেই সেসব দেশে এত সংখ্যক নারী যদি 'আইবুড়ি'র অপবাদ নিয়ে বাঁচতে হয় তবে

সেদেশে মানবিক বিপর্যয় নামা এবং যিনা-ব্যভিচারের দরজা খুলে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আজ আমরা বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তরে সেই ঘৃণ্য বাস্তবতাই পরতে পরতে প্রত্যক্ষ করে চলেছি। হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দিন যত গড়াবে পৃথিবীতে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে তুলনামূলক নারীর সংখ্যা অধিকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পরিবর্তিত সেই বিশ্বে তখন নারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষা হবে কীসে? সুতরাং নারীজীবনের এই শ্বাশ্বত অধিকার রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে একাধিক বিবাহ সম্পর্কিত ইসলামী মতাদর্শ।

একাধিক বিবাহ সম্পর্কে ইসলামের ভাবনা : একাধিক বিবাহের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, এসম্পর্কিত বিতর্ক, ঐতিহাসিক বাস্তবতা, বিশ্বের সকল ধর্মে একাধিক বিবাহের স্বীকৃতি ও প্রচলন, বৈজ্ঞানিক অপরিহার্যতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা, পর্যালোচনা হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার বিধান ও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শই অকাট্যভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা সে আলোচনায় যাব না। সংক্ষিপ্তভাবে শুধু সাহাবা, তাবেঈ ও বুজুর্গানে কেরাম এই বিষয়টি কীরূপ গুরুত্ব প্রদান করতেন তা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত একটা কথা না বললেই নয়, জগতের মানুষ বহুবৈচিত্রের অধিকারী। তাদের জীবনযাপন পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। কোনো মানুষের জন্য সামান্য আহারই যথেষ্ট। কিন্তু অন্যজনের জন্য সামান্য আহারে বেঁচে থাকাই কষ্ট। এই বিষয়টি যেমন যৌক্তিক ও

বৈজ্ঞানিক সত্য, তেমনিভাবে মানুষের শারীরিক সক্ষমতার তারতম্য হওয়ার বিষয়টিও ততোধিক যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত। তাহলে একজন মানুষ তার প্রয়োজনে অন্যের তুলনায় অধিক আহার গ্রহণ করলে নিন্দনীয় না হলে একই কারণে একাধিক বিবাহ করলে সে নিন্দনীয় হবে কেন? জীবন বাঁচানোর জন্য যদি বেশি খাবারের প্রয়োজন হয় তবে কোনো ব্যক্তির এক নারী যথেষ্ট না হলে এবং সে কারণে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ালে সেক্ষেত্রে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য একাধিক বিয়ে করতে পারবে না?

মনে রাখা উচিত, দুনিয়ার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, তাই এই সংক্ষিপ্ত জগতের জন্য যতটুকু করা চাই, আখেরাতের চিরকালীন যিন্দেগীর জন্য করা চাই তার চেয়ে কোটি গুণ বেশি। আর ইসলামের এই দর্শন সামনে রেখেই সাহাবা, তাবেঈ ও সম্মানিত পূর্বসুরীগণ একাধিক বিয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

সাঈদ ইবন যুবায়েরকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছো? তিনি বললেন, জী না। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন,

«فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً»

'তুমি বিয়ে করো, কেননা এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি, যিনি অধিক নারীর স্বামী। [বুখারী : ৫০৬৯]

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ওফাতের পর মাত্র সাতদিনের মাথায় বিয়ে করেছিলেন। আর প্রিয়নবীর দৌহিত্রের ফযীলত, মর্যাদা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর নিকট তাঁদের আপন হওয়ার বিষয়টি কারো অজানা নয়। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه و سلم من الحسن

‘হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর চেয়ে বেশি অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ্য ছিলেন না।’

মুহাদ্দিসগণ বলেন, সাদৃশ্যের একাধিক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, একাধিক বিয়ের সুন্নতী আমল। সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই একাধিক বিয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের এক বিয়ের ঘটনা একেবারেই বিরল বললেও ভুল হবে না। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহিমাহুল্লাহ বলেন,

كثرة النساء ليست من الدنيا لأن عليا رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان له أربع نسوة وسبع عشرة سرية

‘অধিক স্ত্রী দুনিয়ার অংশ নয়। কেননা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন দুনিয়াবিমুখ সাহাবীগণের অন্যতম। অথচ তাঁর চার স্ত্রী এবং সতেরজন দাসী ছিলেন।’

وكان عمر رضي الله عنه يكثر النكاح ويقول ما أتزوج إلا لأجل الولد

‘আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অধিকহারে বিয়ে করতেন এবং বলতেন, আমি একমাত্র সন্তান লাভের আশায় অধিক বিয়ে করি।’

অনেক সময় মধ্য বয়সে কিংবা পৌঢ় বয়সে কোনো কোনো পুরুষের স্ত্রী মারা যায়। এমন পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের বাধা, পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা, লোকলজ্জা ইত্যাদি কারণে সংশ্লিষ্ট পুরুষ বিবাহ করতে পারে না। এটা মারাত্মক একটা সামাজিক ব্যাধি। এক্ষেত্রে বিয়ের বিষয়টিকে স্বাভাবিক নজরে দেখলে অনেক সমস্যারই সমাধান হতো। বহু নারী মানবেতর জীবনযাপন থেকে রক্ষা পেত।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সবদেশের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে বিধবা নারীদের মানবেতর জীবন। অসহায় এই নারীদের সমাজে মর্যাদার স্থান হওয়ার জন্য বিপত্নীক পুরুষদের বৈবাহিক বন্ধনের সূত্রে এগিয়ে আসার দ্বারা সমাজের এই বিরাট সমস্যাটা সহজেই দূর হতে পারত। আর এটা শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবসেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ইসলামেরও মহান বিধান। সাহাবায়ে কেরাম অবিবাহিত অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে সাক্ষাত হওয়াকে নিজেদের দীনদারী ও ধার্মিকতার ত্রুটি বলে মনে করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন-

لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج لكيلا ألقى الله عزبا

‘আমার যদি জীবনের মাত্র দশটি দিন অবশিষ্ট থাকে তখনও আমি চাইব বিয়ে করতে। যাতে আল্লাহর সঙ্গে বিপত্নীক অবস্থায় আমাকে সাক্ষাৎ করতে না হয়।’

ومات امرأتان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الطاعون وكان هو أيضا مطعونا فقال زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا

‘প্লেগ মহামারীতে মু‘আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর দুই স্ত্রী মারা যান। তিনি নিজেও মহামারীতে আক্রান্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি বললেন, আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও, আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও। কেননা আমি আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে বিপত্নীক অবস্থায় সাক্ষাত করতে অপছন্দ করি।’

إن أحمد تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبد الله وقال أكره أن أبيت عزبا

‘বর্ণিত আছে, আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনে বিয়ে করেন এবং বলেন, আমি বিপত্নীক অবস্থায় রাতযাপন করা অপছন্দ করি।’

বস্তুত একজন নেককার স্ত্রী স্বামীকে দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করে এবং এতে পুরুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সহজ ও মধুময় হয়।

মোটকথা, একাধিক বিবাহের মধ্যে এমন কতক চিরন্তন সত্য উপকারিতা রয়েছে যা অস্বীকার করার জো নেই এবং এই আমল বাস্তবায়ন ছাড়া তা কখনই অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে

এটাও বাস্তব যে, এই বিষয়টি বাঁকা চোখে দেখার কারণে সমাজে নানারকমের অশান্তি দেখা যায় এবং পাপের বহু রকম পথ খুলে যায়।

পাকিস্তানের চারবোনের একসঙ্গে আত্মহত্যা, পুরুষদের প্রতি সৌদি নারীদের চার বিয়ের আবেদন এবং কুরআন-হাদীসের আদেশ ও দিকনির্দেশনা জানার পরও কি কেউ একাধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে? বস্তুত যারা একাধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে তারা মূলত নারীর অধিকার রক্ষার জন্য করে না, পুরুষকে বহুগামী আর নারীকে বহুবিছানার সঙ্গী হওয়ার নিকৃষ্ট চারিত্রিক অধঃপতন দেখতে চায় বলেই এরূপ করে।

অবশ্য সৌদি নারীদের এই আবেদনের অপর দিকে ঐতিহ্যগত একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আছে এবং অতি যৌক্তিকতার কারণেই সৌদি নারীগণ এধরনের বিবাহবন্ধনের বিষয়টি স্বীকৃত ও গ্রহণীয় বলে মেনে নিয়েছেন। কিছুদিন আগে ‘স্ত্রীর শেষ ইচ্ছায় এক সৌদির ৯০ বছরে বিয়ে’ শিরোনামে পত্রিকায় একটি খবর বের হলো। খবরে প্রকাশ :

ঘটনাটি ঘটেছে সৌদিতে। সৌদি নিবাসী ফাতিস আল থাকাফি’র (৯০) স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তার সন্তানেরা মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তার ওপর বিয়ের জন্যে চাপ সৃষ্টি করে। ফাতিসের প্রয়াত স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা ছিল তিনি যেন পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এরপর ৫ মেয়ের জোরাজুরিতে ৯০ বছর বয়সেই দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মত হন বৃদ্ধ ফাতিস। তিন মাস খোঁজার পর বাবার জন্য পাত্রীর সন্ধান পান মেয়েরা। ৫৩ বছরের নিঃসন্তান এক বিধবাকে খুঁজে তারা দ্বিতীয় মা হিসেবে বেছে নেন। বিয়েতে ফাতিস তার নতুন স্ত্রীকে ২৫০০ সৌদি রিয়াল দেনমোহর প্রদান করেছেন। [তথ্যসূত্র: ঢাকা রিপোর্ট টোয়েন্টিফোর.কম/এম.]

নারীদের এমন উদারতা থাকাই কাম্য। অনেক মহিলা মৃত্যুর আগে স্বামীর কাছে ওয়াদা নেয় তার মৃত্যুর পর যেন স্বামী অন্য কোনো নারীকে বিয়ে না করে! কী ধরনের মানসিকতা এটা! ভালোবাসার নামে এ কোন দায়বদ্ধতা? তথাকথিত ভালোবাসার এসব দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করছে হাজারও অপ্রীতিকর ঘটনা। এসব অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে স্বাভাবিক ও শরীয়তসিদ্ধ এই বিধানটা কি সহজভাবে মেনে নেওয়া যায় না? আলোচনা শেষ করব একটা হাদীস দিয়ে। যে কোনো মুমিনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন নবী-রাসূলগণের সঙ্গে জান্নাতে বসবাস। আর এই সুযোগ লাভের প্রধান উপায় তাঁদের সুন্নাতের অনুসরণ করা। নবী-রাসূলগণের সামগ্রিক ও সার্বজনীন কিছু সুন্নাত রয়েছে। ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন-

من سنن المرسلين الحلم والحياء والحجامة، والسواك، والتعطر وكثرة الأزواج

‘রাসূলগণের প্রধান সুন্নাতগুলো হচ্ছে, ধৈর্য-সহনশীলতা, লজ্জাশীলতা, শিঙ্গা লাগানো, মেসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং একাধিক বিবাহ।’ [জামেউস সাগীর]

আমরা কি পারি না একাধিক বিবাহের বিষয়টি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নারীদের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে নবী-রাসূলগণের সঙ্গে বসবাস করার অধিকারী হতে?

ফেসুবক : মৃত্যুদুয়ারে নতুন অতিথি!

মানুষের মৃত্যু দূতের আগমন সুনিশ্চিত হলেও আগমনের পথ ও অলিগলি অনেক। দিনদিন বাড়ছে মৃত্যুদূতের আগমন গলির সংখ্যা। নিত্যনতুন অবয়বে মানুষের হায়াত-দরজায় হানা দিচ্ছে জান ছিনতাইতারী এই অতিথি। কখনও আসছে জানা ও পরিচিত বেশে, কখনও বা একেবারেই নতুন ও অপরিচিত বেশে। চিন্তা করা যায়, যে নারীকে মানুষ পরম মমতা দিয়ে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অন্তরঙ্গতার বেশে কাটানোর মহৎ উদ্দেশ্যে মমতা-নীড়ে নিয়ে আসে, সেই নারীই কিনা স্বামীর মৃত্যু ও যমদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়! হ্যাঁ, বিশ্বাসের সব আঙিনা ছাড়িয়ে বাস্তবতার আঙিনায় এই সত্যই আছড়ে পড়ছে যে, স্ত্রী কেবল প্রাণসঙ্গীই নয়; কখনও কখনও স্বামীর যমদূত ও মৃত্যুদুয়ারের নতুন অতিথিও বটে।

আমাদের এই ভাষ্য বরাবরের মতোই চিরন্তন সত্য হয়ে ধরা পড়ল টঙ্গীর একটি ঘটনায়। ২০১৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর রাতে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় সংঘটিত হয় সেই ভয়াবহ ঘটনাটি। টঙ্গী রেলস্টেশনে অবস্থিত তৃপ্তি হোটেলের মালিক ব্যবসায়ী সাইফুল

ইসলামকে স্ত্রী টুম্পা ও তার প্রেমিক রকি ভাড়া করা সন্ত্রাসীদের দিয়ে হত্যার পর লাশ লাগেজে ভরে রাস্তার পাশে ফেলে যায়।

সাইফুল হত্যা মামলায় নিহত সাইফুলের স্ত্রী নূরজাহান আক্তার টুম্পা ও তার প্রেমিক রকিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর হত্যাকান্ডের মূল রহস্য বেরিয়ে আসে। ফেসবুকে রকির সঙ্গে সাইফুলের স্ত্রী টুম্পার পরিচয় ও পরকিয়া প্রেমের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে টুম্পা ও তার প্রেমিক রকি স্বীকার করে। পুলিশ সুপার আব্দুল বাতেন বলেন, ফেসবুকের মাধ্যমে অনৈতিক সম্পর্কের কারণেই সাইফুলকে স্ত্রী টুম্পা ও কথিত প্রেমিক রকিসহ (২২) তার সহযোগীদের নিয়ে নিজ বাসায় হত্যা করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার লিখিত বক্তব্যে আরো জানান, হত্যার দুই মাস পূর্বে হোটেল ব্যবসায়ী সাইফুল ৫দিনের জন্য গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী গেলে ওই দিন রাত ১১ টার সময় টুম্পা রকিকে ফোনে তার বাসায় আসতে বলে। পরে রকি সারা রাত বাসায় থেকে সকাল ৭টায় বের হয়ে যায়। ওই রাতেই সাইফুলকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। সে অনুযায়ী গত ৩ সেপ্টম্বর সন্ধ্যায় তার নিজ ফ্ল্যাটের শয়নকক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রী টুম্পা ও কথিত প্রেমিক রকির ভাড়াটে সন্ত্রাসী দিয়ে হত্যা করে সাইফুলকে।

এভাবেই আমরা বরণ করে নিয়েছি বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও আধুনিকতার সাজসরঞ্জাম। প্রেমের সম্পর্ক এখন গড়ে উঠছে অনলাইনে, ফেসবুকে। কিছুদিন আগেও প্রেমের প্রথম ধাপ মানেই

ছিল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে, চত্বরে, আড্ডার ফাঁকে কিংবা নির্জন কোনো এক পরিসরে দুরু দুরু বুকে পছন্দের প্রিয় মানুষটিকে জানিয়ে দেওয়া মনের কথাটি। কখনো লজ্জায় মুখোমুখি আবার কখনো বা ছোট্ট চিরকুট। তারপর হয়তো ক্যাম্পাস ছেড়ে পার্ক বা কফি শপ। প্রেম বলতে তখন ছিল ঈদ এলে প্রিয় মেয়েটির বাড়ির সামনে গিয়ে অকারণ হাঁটাহাঁটি বা বারান্দায় তাকে দেখে আড়চোখে তাকানো। তারপর অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা। কিন্তু সময় বদলেছে। এখনকার প্রজন্ম প্রেম করছে ফেসবুকে।

এখন সম্পর্ক ভাঙা-গড়া সবই নির্ভর করছে একটি মাউসের ক্লিকের ওপরে। নিমেষে বদলে যাচ্ছে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস। কখনো সিঙ্গেল থেকে ইন অ্যা রিলেশনশিপ আবার কখনো এনগেইজড থেকে সিঙ্গেল। মার্কিন মনোবিদেরা সম্প্রতি জানিয়েছেন, রোমান্সের দুনিয়ায় এখন ফেসবুক প্রেম বাড়ছে আর বাড়ছে অনলাইন ডেটিং। এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে রয়টার্স। ডেক্সটপ, ল্যাপটপ পেরিয়ে মুঠোফোনের অ্যাপ্লিকেশনের সুযোগ অনলাইন সাইটগুলোতে সক্রিয় রাখছে নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের। কখনও কখনও বিবাহিতরাও জড়িয়ে পড়ছে কম্পিউটার-ল্যাপটপ আশ্রিত ডিজিটাল প্রেমে। ব্যস্ত সময়ের চাপ কাটিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের সময়-সুযোগ কমে গেছে বলেও হয়তো ফেসবুক প্রেমে জড়িয়ে পড়ছে অনেকেই। লাখ লাখ প্রোফাইল থেকে খোঁজ চলছে একটা সুন্দর মুখের।

অনেকে আবার প্রতারণা বা নিছক মজার উদ্দেশ্যেও খুলছেন ভুয়া ফেসবুক প্রোফাইল। অনেকেই আবার সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে বাঁচতে বন্ধুত্বের উষ্ণতা খুঁজছেন ফেসবুকে। এভাবেই অসত্য লুকোচুরির আশ্রয়ে ফেসবুকের পাতায় ঢুকে পড়ে প্রেম ভাইরাস। যার বিকল্প শক্তিশালী এন্টিভাইরাস না থাকায় মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয় স্বামী সাইফুলকে। যোগাযোগের মাধ্যম যতই অবারিত হয়েছে মৃত্যুফাঁদ ততই গভীর ও প্রাণঘাতী হয়েছে। এক্ষেত্রে ফেসবুকের ভূমিকা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

ফেসবুককে কেন্দ্র করে কল্পনার পেলব পাখায় যোগ হয়েছে একেকটি পালক আর তাতে বেড়েছে স্বপ্নের ফানুস। হৃদয়াকাশে জমেছে বাহারি রংধনু তাই মানুষ ওড়ে দিবাস্বপ্নের ডানা মেলে। চিন্তা করেনি গন্তব্যে ফেরার, তাই আছড়ে পড়েছে বাস্তবতার রুক্ষভূমিতে। কম্পিউটার মানুষের মনে আধুনিকতার রংধনু ছড়িয়ে দিয়েছে। এই রংধনুর মায়াবী রং তাদেরকে উদার আহ্বান জানায় হৃদয়ে কল্পনার রং আঁকতে। সেই কল্পিত রঙের ওপর তাই তারা আঁকে স্বপ্ন ও জীবন বাঁধার নতুন নতুন ঘর। সেই ঘরের স্থায়ীত্ব, দৃঢ়তার কথা কল্পনাও করে না কখনও। তাই ফলাফলশূন্য। কখনও বা অপ্রত্যাশিত। বিষণ্ন আর হতাশার মধ্যে ফেসবুক যেন আরও বেশি করে কাছে টানে অনেককেই। আজকের এই অতিব্যস্ত জীবনে অনেকেই ফেসবুকে খোঁজেন দম ফেলার ঠাঁই। অনেকে আবেগে বসিয়ে দেন তাদের স্ট্যাটাস, ব্যক্তিগত ছবি; আবার অনেকেই খুঁজে ফেরেন প্রিয় কোনো মুখ। সামনাসামনি যে কথা বলে উঠতে পারা

যায় না, চ্যাটে সেই কথাগুলো কত সহজে বলে ফেলা যায়। কারও সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চাইলে, তাকে বন্ধু তালিকার বাইরে পাঠিয়ে বা ব্লক করে সম্পর্কে অনাগ্রহের কথাও জানানো সহজ। এখন যেন ফেসবুক হয়ে উঠেছে পরিচিত আর অপরিচিত ১০০ কোটি মানুষের মিলনস্থল।

বন্ধুত্বের বিশালতা, সম্পর্কের উন্মুক্ততায় অনেকেই অভিভূত হয়। ফেসবুক পাতার হাজারও সুন্দর রমণীতে পুরুষ কিংবা সুন্দর সুপুরুষে বিমোহিত হয় নারী। কিন্তু তারা খবর রাখে না যে, এ বিশাল জনসংখ্যার নেটওয়ার্কে সবগুলো প্রোফাইল আসল নয়। অনেকেই ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে পেতে রেখেছে প্রতারণার ফাঁস। গলায় ঝুলে পড়লেই বিপদ। সাইফুল হত্যাকাণ্ড ছাড়াও ফেসবুকে প্রতারণার খবর আমরা এখন হরহামেশাই শুনতে পাই। তাই সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে অনলাইন যোগাযোগে সব সময়ই ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, ইন্টারনেটে জীবনসঙ্গী খুঁজে দেয়ার সাইটগুলোতে ৮০ শতাংশ মানুষই তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বাড়িয়ে বলছে অথবা সত্য গোপন করছে।

তাই অনলাইনের অচেনা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমানোর ব্যাপারে সাবধান হোন। অসাবধনতা ও অসচেতনতার কারণে ফেসবুকে প্রেমে পড়ে প্রতারণার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

বহুজাতিক মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান ইউরো আরএসসিজির সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ফেসবুক ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠছে। জরিপকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নর্ম ইউস্তিন বলেন, 'আমাদের বাস্তবজীবন এবং অনলাইন জীবন পরস্পর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অনলাইনে যে লোকজনের সঙ্গে আমরা মিশি আর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে (ফেসবুক-টুইটার) আমরা যে আচরণ করি, তা বাস্তবে আমাদের আচরণকেও প্রভাবিত করছে। তা ভালো-মন্দ যা-ই হোক না কেন।'

মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন, আমাদের সামাজিক প্রবাহে ভূমিকা রাখছে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলো, কিন্তু নারী-পুরুষের একান্ত সম্পর্কে অবিশ্বাস, ঈর্ষা আর সন্দেহের গভীর ফাটলও ধরাচ্ছে। ধ্বংস করছে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন। ভাঙছে বিয়ে এবং কখনও কখনও এই সূত্রে খুন হচ্ছে স্বামী কিংবা স্ত্রী।

শারীরিক ও মানসিক প্রতারণা থেকে শুরু করে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া, সংসার ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটার পেছনে ফেসবুকের মারাত্মক ভূমিকা আমরা নিয়মিতই প্রত্যক্ষ করছি। ফেসবুক থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ঈর্ষা আর এ ঈর্ষা থেকে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ঘটছে সম্পর্কচ্ছেদ থেকে শুরু করে খুন-খারাবীর ঘটনা। অপরিণত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরামর্শ হিসেবে গবেষক ক্লেটন জানিয়েছেন, অতিরিক্ত সময় ধরে ফেসবুক নয়। এভাবেই সামাজিক অন্তর্জালের

মায়াজালে আটকে প্রতারণার শিকার হওয়ার প্রতিষেধক হিসেবে সচেতনতার পরামর্শ দিচ্ছেন মনোবিদ ও গবেষকেরা।

ফেসবুকে প্রেম? সেতো ফ্লোরিডা শহরের মতো খুবই সুন্দর কিন্তু যখন আগুন লাগে নিমিষেই পুড়ে যায় সব কিছু। আগুন তো পোড়ায় ঘরবাড়ি কিংবা দাবানলে পোড়ে বনজঙ্গল, গাছপালা। কিন্তু ফেসবুক হচ্ছে সংসার ভাঙার কুহক। দ্য সানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ফেসবুকের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। যোগাযোগ, সঙ্গ কিংবা সঙ্গীর সন্ধানও মিলছে ফেসবুকে। কারও কারও কাছে ফেসবুক তাদের দ্বিতীয় জীবনও বটে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ফেসবুকই হয়ে উঠেছে বেদনার কারণ। ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের হার তুলনামূলকভাবে বেড়ে গেছে। আর এ জন্য সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুককেই দায়ী করা হচ্ছে।

বিচ্ছেদ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুক্তরাজ্যের আইনজীবীরা বলছেন, ইদানীং ফেসবুকের কারণেই সে দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বেড়ে চলছে। বিবাহিতরা অনলাইনে নতুন কারও সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ছেন কিংবা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এ ছাড়া সন্দেহপ্রবণ দম্পতিরা তাদের সঙ্গীকে পরীক্ষা করার জন্যও ফেসবুক ব্যবহার করছেন। ব্রিটেনের একজন আইনজীবী বলেছেন, নয় মাসে তিনি যতগুলো বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটিয়েছেন, তার সবগুলোই ফেসবুকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে দেশটির আইনজীবীরা বিবাহিত দম্পতিদের ফেসবুক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করছেন।

আধুনিক সভ্যতার এ যুগে আমাদের সামাজিক প্রবাহে ভূমিকা রাখছে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের ওয়েব সাইটগুলো, কিন্তু নারী-পুরুষের একান্ত সম্পর্কে অবিশ্বাস, ঈর্ষা আর সন্দেহের গভীর ফাটলও ধরাচ্ছে তীব্রবেগে। যা বিশ্বের সব বিবেকবান মানুষকে বিচলিত করছে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরাও এক গবেষণাতে ফেসবুক-টুইটারকে সংসার ভাঙার কুহক আর ডাহুক বলেই তথ্য পেয়েছেন।

মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানিয়েছেন, শারীরিক ও মানসিক প্রতারণা থেকে শুরু করে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া, সংসার ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটার পেছনে ফেসবুকের বড় ভূমিকা খুবই মারাত্মক। সব বয়সের বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে 'ফেসবুক সৃষ্ট ঈর্ষা' বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন গবেষকেরা। গবেষকেরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত সময় ধরে ফেসবুক ব্যবহারে 'ফেসবুক-সৃষ্ট ঈর্ষা' তৈরি হতে পারে। সঙ্গীর কার্যক্রম নজরদারি করতে চাওয়া থেকে অতিরিক্ত সময় ফেসবুক ব্যবহার এ ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে।

সাইবার সাইকোলজি, বিহেভিয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাময়িকীতে প্রকাশিত নিবন্ধে প্রধান গবেষক রাসেল ক্লেটন জানিয়েছেন, রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি যখন অতিরিক্ত ফেসবুক ব্যবহার করেন তখন জীবনসঙ্গীর কঠোর নজরদারির মধ্যে পড়েন তিনি। এর ফলে জন্ম নেয় ঈর্ষা। এ ঈর্ষা থেকে সঙ্গীর অতীতের বিভিন্ন কথা তুলে শুরু হয় বাক-বিতণ্ডা।

একারণে গবেষকরা নতুন দম্পতি ও নতুন সম্পর্কে বাঁধা পড়া সঙ্গীদের ফেসবুক ও টুইটার থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। অপরিণত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ পরামর্শ মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে গবেষক ক্লেটন জানান, অতিরিক্ত সময় ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটের ব্যবহার সম্পর্ক ভাঙার ফাঁদ হতে পারে। গবেষকেরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ফেসবুক ব্যবহার না করলে নতুন দম্পতিদের মধ্যে যেমন মনোমালিন্য কমতে পারে তেমনি পরস্পরকে বাড়তি সময় দেয়াও সম্ভব হয়। যারা পরস্পরকে নতুন করে জানছেন, তারা যেন সামাজিক যোগাযোগের ফাঁদে পড়ে সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি না করেন সে বিষয়ে খেয়াল রাখতেই গবেষকেরা নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। কেবল সাইফুল নন, বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ হচ্ছেন ফেসবুকের এই পাতানো সম্পর্কের বলি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে...

এক. ভারতের আনু শর্মাকে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে আসছিলেন তার স্বামী। একদিন আনু তার স্বামীর কিছু টুইট ঘেঁটে প্রতারণার এ বিষয়টি টের পেলেন। ঘটনা গড়িয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত। এক্ষেত্রে আনু শর্মার স্বামী বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন, তবে আনু শর্মার কাছে তথ্যপ্রমাণ হিসেবে ছিল তার স্বামীর করা ‘টুইট’, যা তিনি সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

দুই. কোনো এক ঈদের দিন ফেসবুক ঘাঁটাঘাঁটির সময় ‘প্রিয়া’ নামের একটি সুন্দর মেয়ের প্রোফাইল চোখে পড়েছিল বেসরকারি

অফিসের তরুণ কর্মকর্তা রাজীবের। চোখের দেখা থেকে ভালো লাগা। তারপর ‘প্রিয়া’ নামের অচেনা সেই ফেসবুকে প্রোফাইলে তিনি পাঠিয়েছিলেন বন্ধুত্বের অনুরোধ। প্রিয়ার প্রোফাইলে দেওয়া তথ্যে কোনো গড়বড় পাননি রাজীব। সেদিনই ফেসবুকে বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া আসে প্রিয়ার কাছ থেকে। এরপর থেকে সময় পেলেই দুজন চ্যাটিং আর নানা আলোচনা। একসময় প্রেমের নানা কথাও আলোচনা করেন তারা। এক মাসের মধ্যেই যেন দুজনের মধ্যে দানা বাঁধে গাঢ় প্রেম। এরপর আসে সামনা-সামনি দেখা করার অনুরোধ। কিন্তু সেই দেখা আর হয়নি। তিন মাস পর একদিন রাজীব জানতে পারেন, তার খুব কাছের এক ছেলে বন্ধু ‘প্রিয়া’ নাম দিয়ে ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে তার সঙ্গে প্রেমের এ অভিনয় করেছে। খুব বিষণ্ন হয়ে মুষড়ে পড়েন রাজীব।

তিন. এদিকে প্রায় একই সময় ফেসবুকে তার এক ছেলেবন্ধুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিথি নামের এক তরুণী। সম্পর্কের একপর্যায়ে তিথি যখন জানতে পারলেন, তার ছেলেবন্ধু শুধু তার সঙ্গেই নয়, পরিচিত অনেক মেয়ের সঙ্গেই ফেসবুকে প্রেমের সম্পর্কের পর্যায়ে রয়েছে, তখন তাদের সম্পর্ক আর বেশি দূর গড়ায়নি।

চার. ফেসবুক প্রেমের সম্ভবত সবচেয়ে ভয়ানক উদাহরণ চীনের একটা ঘটনা। সংসারে তিনজন মাত্র সদস্য। ছেলে চাকরিরত। বেশিরভাগ সময়ই বাইরে থাকতে হয় তাকে। স্ত্রী ছোট সংসারের কাজকর্ম একাই সারেন। শ্বশুর বিপত্নীক। কর্মহীন এই পৌঢ়

লোকটির বেশির ভাগ সময় কাটে ঘরে, শুয়ে বসে। ছোট সংসার হওয়ায় ঘরের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে একেবারেই অবসর হয়ে যান স্ত্রী। অবসর সময় কাটান কম্পিউটার আর ল্যাপটপের বাটন টিপে। এদিকে শ্বশুরেরও সময় কাটানোর একমাত্র অবলম্বন ওই কম্পিউটার এবং যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক। অবসর আর নিঃসঙ্গতা কাটাতে দুইজনই বেছে নেন একজন করে ফেসবুক সঙ্গী। অদৃশ্য সঙ্গীর রসালাপে ভালোই কাটে অর্ধবৃদ্ধ আর অর্ধ-অবসর গৃহিণীর অবশিষ্ট সময়। রসালাপ ও উত্তেজক বচন-বাচনে কেটে যায় বেশ কিছুদিন। বন্ধুত্ব গভীর হলে সৃষ্টি হয় পরস্পরে দেখা-সাক্ষাতের তৃষ্ণা। উভয়ের মধ্যেই এই তৃষ্ণা প্রবল হতে থাকে। অবশেষ দুইজনেই সময় করে বের হন নিজ নিজ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। প্রথমে পুত্রবধূ শ্বশুরের কাছে এসে জানান, তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন তিনি। ফিরতে হয়ত দেরিও হতে পারে।

শ্বশুর বুঝতে পারেন, এটা তার কাছ থেকে পুত্রবধূর অনুমতি গ্রহণ নয়; তার অনুপস্থিতিতে ঘর পাহারা দেয়ার বিনয়ী ও কৌশলী আদেশ। তাই তিনি বলেন, বউ মা! ঘরের চাবিটা সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আমাকেও একটু বাইরে যেতে হবে। অনেকদিনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার সঙ্গে সাক্ষাতে যেতে হবে যে!

এভাবে দুইজন দুইজনের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বের হন নিজ নিজ বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে। ফেসবুকে পাঠানো ঠিকানা অনুযায়ী যার যার বন্ধুর কাছে হাজির হন তারা। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে বিস্ময়,

লজ্জায়, অপমানে মাথা নুয়ে আসে শ্বশুর-পুত্রবধূর। তাদের পরস্পরের বন্ধু যে আর কেউ নন, নিজেরা নিজেরাই! একই ঘরে বসে তারা দীর্ঘদিন যাবত দূরের, অদৃশ্য বন্ধুর হাতছানির খেলা করেছেন! ফেসবুকের গেরিলা প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন একই ছাদের বাসিন্দা শ্বশুর-পুত্রবধূ!

এভাবে অবাঞ্ছিত পন্থায়, দৃষ্টিকটু পঙ্কিলতায় চলছে ফেসবুকের সূত্রে প্রেম প্রেম খেলা। দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফেসবুকের এই প্রেম শেষ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ফেসবুকে সম্পর্ক যেমন ঝড়ের গতিতে তৈরি হয় তেমনি ঝড়ের গতিতেই ভেঙে যায়। এ ধরনের গেরিলা সম্পর্ক মানুষের জীবনে সুখ ও অনাবিল আনন্দ আনে না, বরং বয়ে আনে লাঞ্ছনা, চরম বিব্রত ও লজ্জাজনক অপূর্ণ পরিণতি। বিজ্ঞানীয় উপহার প্রতিনিয়ত বিব্রতবোধেই যাপিত করতে বাধ্য করছে আমাদের যাপিত জীবন। বিজ্ঞান! আজ তোমাকে হ্যাঁ বা না কোনোটাই বলার ভাষা আমার নেই। তবে ভালো থেকো...

ব্যবসার নতুন পণ্য ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার সাতকাহন

সৌন্দর্য এবং সুন্দর একটি স্পর্শকাতর বিষয়। মানুষ সুন্দরের পূজারী। খুব কম লোকই পাওয়া যাবে, যিনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে, সৌন্দর্য ও সুন্দর তাকে আকৃষ্ট করে না। আর সৌন্দর্য যদি হয় নারী বিষয়ের তবে অবশ্যই সেটি আরও কাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সকল মানুষকে সমান বা

সবাইকে একই সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেন নি। সাদা-কালো, লম্বা-বেঁটে নানান ধরনের মানুষের সমারোহে মুখরিত আমাদের এই পৃথবী।

পুরুষ কি মহিলা সকল মানুষই বিভিন্ন অবয়বে সৃষ্ট। মানুষের চেহারা বা আকৃতি তার নিজের তৈরি করা নয় বরং এটি সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত নির্দিষ্ট একটি বিষয়। সেজন্য কাউকে খারাপ চেহারার বলে ভর্ৎসনা করা, হিংসা করা বা গালি দেওয়া মস্ত বড় অন্যায়। তেমনিভাবে আরও বড় অন্যায় মানুষের মাঝে সুন্দরকে খুঁজে বের করা এবং তাদের নির্দিষ্ট করে পুরস্কৃত করা, কারণ এতে অসুন্দর মানুষেরা মনে গভীর কষ্ট পেতে পারে। সেই সঙ্গে এটি মানবতার চরম লঙ্ঘনও বটে। কারণ, মানবতার দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। সৌন্দর্য খোঁজা, সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া মানবতার কোনো মাপকাঠিতেই পড়ে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মানবতার চরম লঙ্ঘন হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরের পূজা থেমে নেই। তাইতো বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচলন পেয়েছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। সুন্দরী প্রতিযোগিতা যে হঠাৎ-ই শুরু হয়েছে তা কিন্তু নয়, বরং এরও রয়েছে একটি সুদীর্ঘ ও কলঙ্কজনক দীর্ঘ ইতিহাস ও আখ্যান।

সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিগত ও রাজপরিবারের প্রয়োজনে সুন্দরী প্রতিযোগিতার কাজটি চলে আসছে। মে’ ডে এর রাজা রাণী বাছাইয়ের বহু আগে থেকেই ইউরোপে সুন্দরী প্রতিযোগিতা শুরু

হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় একজন নারী নির্বাচন করা হতো, যে মূলত তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুন্দরী প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। কিন্তু তখনকার রক্ষণশীল সমাজ ও সভ্য নেতৃবর্গের কারণে একসময় তা বন্ধ হয় যায়। পরবর্তী সময়ে আবার সুন্দরী প্রতিযোগিতা শুরু হয় তবে সেটি শুরু হয়েছিল 'ফটো সুন্দরী প্রতিযোগিতা' নামে। আর আধুনিক সুন্দরী প্রতিযোগিতার সূচনা হয় ১৯২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। প্রথমে এটি মানুষের মাঝে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় সেনাবাহিনীতে সুন্দরী নারীর প্রতিযোগিতা। তারপর এটি থেকেই শুরু হয় 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতার ছোট্ট একটি রূপ। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যিনি 'মিস আমেরিকা' খেতাব জয় করেছিলেন তিনি রক্ষণশীলদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন। এরপর আয়োজন করা হয় 'মিস ইউএসএ' এবং 'মিস ইউনিভার্স' প্রতিযোগিতা। ১৯৫২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রথম এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রথম 'মিস ইউনিভার্স' নির্বাচিত হন ফিনল্যান্ডের আরসি কুন্সিলা।

প্রথম দিকে সুন্দরী প্রতিযোগিতা টিভিতে প্রচার করা হতো না। টেলিভিশনে মিস ইউনিভার্স অনুষ্ঠানটির প্রথম প্রচার শুরু করা হয় ১৯৫৫ সালে। প্রথমে 'মিস ইউনিভার্স' এবং 'মিস ইউএসএ' অনুষ্ঠান দুটি টিভিতে যৌথভাবে প্রচার করা হতো। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সাল থেকে আলাদাভাবে অনুষ্ঠান দুটির প্রচার শুরু হয়। এভাবেই এক সময় সুন্দরী বাছাইয়ের ব্যাপারটি বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ

করে। সৌন্দর্যের যোগ্য মূল্যায়ন ও তাদের সম্মান দেওয়ার জন্য প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিষয়টি প্রবল বিতর্কিত ও ঘৃণিত আচার বলে নিন্দিত হলেও গোটা বিশ্বজুড়ে বর্তমানে এটি আগ্রহ এবং উন্মাদনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর শুধু নারীদের নিয়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় তা কিন্তু নয়। প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুবকদেরও অংশগ্রহণে সুন্দর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সুন্দরী বাছাইয়ের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতার নাম 'মিস ইউনিভার্স'। এটি একটি বার্ষিক সুন্দরী নির্বাচন প্রতিযোগিতা। শুরুর দিকে **১৯৫২** সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লথিং কোম্পানি 'প্যাসিফিক মিলস' নামের একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করত। **১৯৯৫** সাল পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল প্রতিযোগিতাটি। এরপর **১৯৯৬** সালে 'ডোনাল্ড ট্র্যাম্প' এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বর্তমানে 'মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন' নামের একটি সংগঠন প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করে থাকে। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন 'মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন' ২০০২ সালের ২০ জুন তারিখ থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটির আয়োজন কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ধীরে ধীরে এর ব্যাপকতা বাড়তে থাকলে প্রতিযোগিতাটির ব্যপ্তিও বৃদ্ধি পায়। সুন্দরী প্রতিযোগিতার মধ্যে মিস ইউনিভার্স সবার থেকে আলাদা। কারণ

এই প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র নারীর সৌন্দর্যকে বিচার করা হয় না। সেজন্য মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় নারীদের গায়ের রং কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এখানে শারীরিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি নারীর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, সাহস, চতুরতা, মানসিকতা, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়। নেপাল ও আর্মেনিয়ার মতো বিশ্বের অনেক দেশ অর্থ সঙ্কটের কারণে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না। আর প্রতিবার অংশগ্রহণ করার মধ্যে রয়েছে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র দেশগুলি। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে মুসলিম দেশগুলো এই প্রতিযোগিতায় তাদের প্রতিযোগী পাঠায় না।

প্রতি বছর মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা শুরুর আগে নির্ধারিত সময়ের আগে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণেচ্ছু দেশের জাতীয়ভাবে নির্বাচিত সুন্দরীদের তালিকা আহ্বান করে। কোনো দেশে জাতীয়ভাবে সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠানটি নির্ধারিত মডেল এজেন্সির মাধ্যমে সেই দেশ থেকে প্রার্থী নির্বাচন করে থাকে। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সর্বনিম্ন বয়স হতে হয় ১৮ বছর। অনেক প্রতিযোগীকে ছাঁটাই করার পর সেমিফাইনালে পাঁচজন সুন্দরীর মধ্যে তিনজন সুন্দরী নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হন যিনি তাকেই বলা হয় ‘মিস ইউনিভার্স’। বাকি দুজন প্রথম রানারআপ এবং দ্বিতীয় রানার আপ নির্বাচিত হন। যিনি ‘মিস ইউনিভার্স’ খেতাব জয় করেন তিনি একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হন এবং ওই কোম্পানির পক্ষ থেকে চুক্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কাজ

করেন। এছাড়া তার জন্য পুরস্কারের ছড়াছড়ি তো থাকেই। বিশ্বজুড়ে খেতাব অর্জনের খ্যাতি ছাড়াও নানান রকম আলিশান জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা হয় মিস ইউনিভার্সের জন্য।

মিস ইউনিভার্স হওয়া সত্ত্বেও পরে আবার মুকুট কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও আছে। ২০০২ সালে রাশিয়ার আক্সানা সানজুয়ান মিস ইউনিভার্স নির্বাচিত হলেও চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করায় তার মুকুটটি পরবর্তীতে পরানো হয় প্রথম রানার আপ পানামার জাস্টিন পাসেককে। বিশ্বজুড়ে সমাদৃত এই আয়োজনটি বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় দেড়শ কোটিরও বেশি দর্শক টিভি পর্দায় উপভোগ (!) করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী নারীদের সমমর্যাদার বিষয়ে সোচ্চার আলোচনা চললেও তারাই আবার এই সকল ব্যবসার মাধ্যমে নারীদেরকে ব্যবসায়িক পণ্য বানিয়ে ফেলেছেন। বড্ড অবাক লাগে একথা ভেবে যে, এরা বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে খুবই সোচ্চার। কিন্তু সুন্দরীদের খুঁজে খুঁজে তাদেরকে বিলাসী জীবনের আয়োজন করে দেওয়া কোন ধরনের অধিকার রক্ষা? যদি তারা নারী অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চারই হতো তবে তো কুশ্রী নারীদের খোঁজ নিয়ে তাদের বিয়ের ব্যবস্থার জন্য অর্থ খরচ করতো? কারণ, সুন্দরী নারীদের পাত্রস্থ করা সহজ। পক্ষান্তরে কুশ্রী নারীদের পাত্রস্থ হওয়াটা অন্তত এই বিশ্বপরিমণ্ডলে বেশ কঠিন এবং একারণেই বিশ্বের প্রায় সবজায়গাতেই কুশ্রী ও কম সুন্দরী নারীরা নিগৃহিত ও অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। তারা কঠিন ও দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরীদের গলায় মিস ওয়ার্ল্ডের তকমার নামে তেলের মাথায় তেল দেওয়ার কৌতুক না করে বিপদগ্রস্ত, অসুন্দর, কুশ্রী নারীদেরকে বিপদমুক্তির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেন না কেন?

মিস ইউনিভার্সকে মূলত একটি ব্যবসা বলা যেতে পারে। আর এই ব্যবসার পণ্য হয়ে থাকেন সুন্দরী নারীরা। এ কথা স্বয়ং ওই ঘর থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে আগে কখনও সুন্দরী প্রতিযোগিতা কিংবা সুন্দরী খোঁজার নির্লজ্জ বেহায়াপনার আয়োজন ছিল না। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য নেটওয়ার্ক বিস্তারকারী মাল্টিলেভেল ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলোর ব্যবসার সংজ্ঞায় যোগ হয়েছে নতুন আরেকটি উপাদান। অর্থনীতির সংজ্ঞায় ব্যবসা ও কোম্পানির জন্য চারটি উপাদান জরুরি। শ্রম, পুঁজি, মালিক ও ভূমি। সংজ্ঞাবিদদের অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছে আরেকটি বস্তু- নারী। নতুন সংযোজিত এই বস্তুটাই হয়েছে ব্যবসার প্রধান উপাদান। একারণে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো কোনো দেশে ব্যবসা বিস্তৃত করার পর পরই হাত দিচ্ছে ওই দেশের নারী সম্পদের ওপর। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

ইউনিলিভার কোম্পানিটির ব্যবসা সারাবিশ্ব জুড়ে। বাংলাদেশে তারা বেশকিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকে। কিন্তু সময় মতো ঠিকই ফণা তোলে তারা এবং অত্যন্ত কূটকৌশলে আয়ত্ব করে নারী সম্পদ। এদেশে সর্বপ্রথম তারাই সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নারীদেরকে ব্যবহারিক পণ্যে পরিণত করে। সুন্দরী প্রতিযোগিতা যে নিছক ব্যবসা এবং উদ্যোক্তরা তাদের ব্যবসায়ীক স্বার্থ হাসিলের জন্যই এই

কাজটি করে থাকে তা স্বয়ং এই জগত থেকে উঠে আসা একজন মডেল ও অভিনেত্রীর মুখেই উচ্চারিত হচ্ছে। তিনি জাকিয়া বারী মম। মিডিয়ায় আগমন ঘটে তার এরকমই একটা সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। হুমায়ুন আহমেদের ‘দারুচিনি দ্বীপ’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তার অভিনয় জগতে প্রবেশ। এরপর নাটক, টেলিফিল্মে অভিনয়ের মাধ্যমে এ জগতেই তার দীর্ঘ বিচরণ। কিছুদিন আগে একটি অনলাইন পত্রিকার সঙ্গে সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি। নিম্নে তার সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো।

মম’র কাছে প্রথমে তার কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। মম অনেকটা ক্ষেদ ও ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, ‘আমরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করি, অথচ আমাদের কাজের কোনো মূল্য নেই। কলকাতা থেকে আমাদের নাটক অনেক ভালো হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তা দেখছে না। দেখছে কলকাতার জিটিভি। এটা হচ্ছে মানুষের ভেতরে দেশপ্রেম না থাকার কারণে। এক শ্রেণীর সার্টিফিকেটধারী গৃহিণী আছে যারা কল্পনার রাজত্বে বসবাস করে। আমি বলতে চাই যে, কল্পনায় বসবাস করে লাভ নেই। দেশকে ভালবাসুন।’

বর্তমানে বিনোদন জগত সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘বিনোদন সেক্টরে আমরা যারা আছি তাদের কোনো পেট্রোনাইজ করা হয় না। আমাকেও কেউ পেট্রোনাইজ করে নাই। আমি যদুমধুদের সঙ্গে কাজ করে মম নামটাকে এস্টাবলিশ করেছি। তারপর বড় ডিরেক্টররা

আমার নামটাকে সেল করার জন্য এখন আমাকে অনেক টাকা দিয়ে কাস্ট করে। এটা কিন্তু আমার একটা দুঃখবোধ।’

মম এ পর্যন্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তার ভাষায় এ পুরস্কারের সংখ্যা প্রায় ২৭টি। বর্তমান পুরস্কারদাতাদের হালচাল সম্পর্কে তিনি তার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘দলীয়করণ আর নোংরামির ভেতরে সবাই ডুবে গেছে। প্রথম আলো পুরস্কার মানেই জয়া আহসান, প্রথম আলো পুরস্কার মানেই ফারুকী, মোশারফ করিম। তারাই কিন্তু শুধু অ্যাক্টর নয়, তারা এতই অবাঞ্ছিত অভিনয় করেন যে সেটা নেওয়ার মতো না। তাহলে তারা কীভাবে বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পান? মুখে কালি মেখে অভিনয় করে যদি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়া যায়, তাহলে তো রাস্তার একটা ছেলেও অভিনয় করবে, হচ্ছেও তাই।’

এটা কি প্রথম আলো পুরস্কার পাননি বলে বলছেন; ‘প্রথম আলো আমাকে পুঁছল কি-না তাতে আমার কোনো খেদ নেই, বরং আমিই প্রথম আলোকে পুঁছি না। প্রথম আলোর চেয়েও বড় পুরস্কার আমার ঘরে আছে। ফিল্মে অভিনয় করার জন্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আমাকে বেস্ট অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কার দিয়েছে। এটা প্রথম আলোর দশটা অ্যাওয়ার্ডের চেয়েও অনেক বেশি সম্মানের।’

অভিনেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মম বলেন, ‘বাংলাদেশের অধিকাংশ আর্টিস্টের প্রপার শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। যেমন ধরেন তিশা কিন্তু লেখাপড়া কমপ্লিট করে নাই।

কোথাকার কোন টেলিকমিউনিকেশনে পড়তো, আজীবন পড়েই যাচ্ছে। বিন্দু জাহাঙ্গীরনগর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। মীম জাহাঙ্গীরনগরে আমার ডিপার্টমেন্টেই পড়তো। পরপর দুইবার ফেল করায় বহিষ্কৃত হয়েছে। শুধু তারা নয় খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ম্যাক্সিমাম আর্টিস্টেরই এই অবস্থা।'

প্রচুর সুন্দরী প্রতিযোগিতা হচ্ছে, তিনিও একটা সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই এই জগতে এসেছেন। এ ব্যাপারে মমর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, **'পৃথিবীব্যাপী সুন্দরী প্রতিযোগিতা হচ্ছে একটা ব্যবসা। মেয়েরা হচ্ছে ব্যবসার উপকরণ। ছোট কাপড়ের মেয়েরা ব্যবসার ভালো উপকরণ, আর বড় কাপড়ের মেয়েরা ব্যবসার অপেক্ষাকৃত কম উপকরণ। আমি নিশ্চয় বিষয়টা বুঝাতে পেরেছি। তাই সুন্দরী প্রতিযোগিতা শুধু ব্যবসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর চেয়ে বেশি কিছু না। সুন্দরী হতে হলে যে শুধুমাত্র গড গিফটেড চেহারা, সুন্দর চোখ নিয়েই আসতে হবে তা নয়। সুন্দরী হলো মেধা, বুদ্ধি ও শিক্ষার সমন্বয়।'**

আমাদের দেশের একজন সুন্দরী প্রতিযোগিতার কর্ণধারকে বলতে শুনেছিলাম, 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা নাকি ষোড়শী ছাড়া হয় না। তরুণীদের প্রতিটি বয়সে আলাদা আলাদা সৌন্দর্য আছে বটে, কিন্তু ষোড়শী সুন্দরীর মেধা কোন লেভেলের থাকে যে সে সৌন্দর্যটা ক্যারি করতে পারবে? পারে না। কারণ অল্প বয়সী মেয়েদের পিক করা হয় বিপথগামী করার জন্য। যারা বুদ্ধিমান, যারা বিচক্ষণ তারা হয় তো ঐ ট্র্যাপে পা না দিয়ে নিজের একটা আইডেন্টি তৈরি করতে চেষ্টা

করে। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অল্প বয়সী ষোড়শী সুন্দরীদের নিয়ে ব্যবসা করা। এটা আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে বলছি।'

মম এ পর্যন্ত অসংখ্য ধারাবাহিক ও এক ঘণ্টার নাটকে কাজ করেছেন। নাটকের মানের প্রসঙ্গ টানতেই তিনি বলেন, 'বর্তমানে চ্যানেল বেশি, কম্পিটিশন বেশি, কিন্তু এই কম্পিটিশন সুস্থ কম্পিটিশন না, অসুস্থ কম্পিটিশন। [সূত্র : ঢাকা রিপোর্ট টোয়েন্টিফোর.কম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩]

এই সাক্ষাতকারে শোবিজ জগতের অনেক অনুল্লেখিত বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। দর্শকরা যারা নিত্যদিন টিভির সামনে বসে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করছেন এবং যাদের অভিনয় দেখে বাহবা বাহবা করে ইহকাল-পরকাল নষ্ট করছেন তারা প্রকৃতপক্ষেই সমাজের কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ লোক তাও এই সাক্ষাতকারে ফুটে উঠেছে। তবে সবচেয়ে যে তিক্ত কথাটা বের হয়ে এসেছে তাহলো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা নারীর নিজের স্বার্থে করা হচ্ছে না। বণিকরা নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে করছে এবং নারীদেরকে ব্যবসার পণ্য ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হচ্ছে না।

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতাসহ বিশ্বব্যাপী সুন্দরী প্রতিযোগিতা যেভাবে নগ্নতায় পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাতে এটিকে একটি প্রতিযোগিতার বদলে নারীর শরীর প্রদর্শনের উৎসব বললেও ভুল হবে না। নারীদের মর্যাদা ক্রমেই নিঃশেষ করে ফেলছে এই প্রতিযোগিতাগুলো। বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই, কেবল

বাংলাদেশের সুন্দরী প্রতিযোগিতার ফলাফলগুলোর দিকে তাকালেই আঁতকে উঠতে হয়। সুন্দরী প্রতিযোগিতার হঠাৎ উত্থিত সিড়রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা এই তরুণীগুলো যেন জীবনের সংজ্ঞাগুলো হঠাৎ ভুলে গেছে। তাই বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়গুলো যতগুলো কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জড়িত এই সুন্দরী প্রতিযোগিতার রমণীরা। তাহলে বুঝুন ঠ্যালা!

হাতুড়ে সংজ্ঞাবিদের কাঁচিতে খণ্ডবিখণ্ড 'বাঙালিয়ানা' সংজ্ঞা!

'বাঙালিয়ানার' নতুন সংজ্ঞা উঠে এসেছে জনৈকা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর মুখ থেকে। তার সংজ্ঞায় সে মন্তব্য করেছে, 'মাথায় কাপড় ও নেকাব বা হিজাব পরা নারীরা কখনোই বাঙালি নয়।' সেই সঙ্গে সে বাঙালিয়ানা থেকে দাড়ি-টুপিকেও বাদ দিয়েছে। আর তার এমন মন্তব্যে ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ফেসবুকে। কিছুদিন আগে একাত্তর টিভিতে 'সংস্কৃতিজনের রাজনীতি ভাবনা' শীর্ষক এক টকশোতে সে বাঙালিয়ানা নিয়ে এমন মন্তব্য করে। মিথিলা ফারজানার উপস্থাপনায় টকশোতে সে ছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার মামুনুর রশীদ, অভিনেতা তারিক আনাম খান।

আলোচনার এক পর্যায়ে মিতা হক বলে, 'আজকে তুমি (সঞ্চালক মিথিলা ফারজানা) আর আমি শাড়ি পড়ে বসেছি। মামুন ভাই (নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ), তারিক ভাই (নাট্যব্যক্তিত্ব তারিক

আনাম) পাঞ্জাবি পরে বসেছে। কেউ দাড়ি-টুপি লাগিয়ে নেই। কেউ লম্বা সিঁদুর পরেও নেই। কেউ হিন্দু, শিখ। আমাদের কমন পরিচয় আছে। ছেলেরা একরকম পোশাক পরবে, মেয়েরা একরকম পরবে।'

সে আরো বলে, 'আমাদের না আইডেন্টি ক্রাইসিসটা এতো বাজে। আজকাল বাংলাদেশে রাস্তায় বেরিয়ে, কোনো ডাক্তারখানায় বা হাসপাতালে গিয়ে, যেখানে একটু লোকজনের সমাগম বেশি, যেখানে ওয়েটিং রুম আছে, লোকজন অপেক্ষা করছে, সেখানে দেখি যে, একমাত্র আমিই বাঙালি। আমি শাড়ি পরে গেছি আর আমার মাথায় ঘোমটা নেই। আজকাল তারা এইটুকু মুখ (নেকাব বা হিজাবের শুধু চোখ ছাড়া সম্পূর্ণ মুখ ঢাকা) বের করে রাখছে। এতে তারা আর যাই হোক বাঙালি নয়।'

সে যে দেশে বাস করে সেই দেশ যে তার বাপের তালুক নয় এবং তার মতো স্বল্পশিক্ষিত নারীর সংজ্ঞায় দেশের নাগরিকদের সংজ্ঞা নিরূপিত হয় না সে তথ্য সম্ভবত সে জানেই না। আসলে দেশটা আজ অদ্ভুত প্রতিযোগিতার মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। পুচকি-পাচকা লোকেরা টিভি কিংবা সাংবাদিক ক্যামেরার সামনে পড়লেই নিজেকে উঁচুদরের কেউ মনে করে খিস্তিখেউর করে যাচ্ছে এবং বেছে বেছে টার্গেট করছে ইসলামকে। নইলে গায়িকার পেশার মতো একটা পেশায় জড়িত এ নারী কোন সাহসে নির্ণয় করে দেশের নাগরিকদের সংজ্ঞা? বাঙালিয়ানাকে সে ইসলাম ও পর্দা থেকে আলাদা করার দুঃসাহস পায় কোথা থেকে? সে কি জানে বাংলাদেশ হওয়া পর্যন্ত এদেশ রচিত হওয়ার পূর্ণ ইতিহাস? জানবে কি করে?

এদের মতো ভোঁতা ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের লোকেরা ইতিহাসের মতো কঠিন জ্ঞান হাসিল করতে পারে?

সঙ্গত কারণেই তার এই মূর্খতাসুলভ হইচই সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেনি। এ বক্তব্য নিয়ে ফেসবুকে অনেকেই বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হুবহু তুলে ধরা হলো-

আবু সুফিয়ান লিখেছেন, '.. (ওই মহিলার) তত্ত্ব অনুযায়ী শেখ হাসিনা বাঙ্গালী না। বঙ্গমাতাও বাঙ্গালী না। কারণ বঙ্গমাতা মাথায় কাপড় দিতেন। শেখ হাসিনাও মাঝে মাঝে মাথায় কাপড় দেন।'

এ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক একেএম ওয়াদিদুজ্জামান লিখেছেন, 'আমি বাঙ্গালী' কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে তো জানতে হবে যে আমি নিজেকে 'বাঙ্গালী' বলে দাবী করেছি কী না? প্রাচীন 'বঙ্গ' রাজ্যের 'বাঙ্গাল'রা কখনোই বৃটিশ শাসনের বাই প্রোডাক্ট কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গায়িত 'বাঙ্গালী' পরিচয়ে পরিচিত হতে চায় নাই, এখনো চায় না। বৃটিশ আমলেই প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) 'বাঙ্গাল'কে পুংলিঙ্গ এবং 'বাঙ্গালী'কে স্ত্রী লিঙ্গ বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে বাহ্মণ্যবাদীরা থাকায় তাদের সৃষ্ট এই 'বাঙ্গালী' ভাবধারাটি প্রায় সর্বোতভাবে অন্য ধর্মের সাংস্কৃতিক উপাদানকে অস্বীকার করে এসেছে। যে কারণে শতবর্ষ পুরাতন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে 'বাঙ্গালী বনাম মুসলিমদের ফুটবল

ম্যাচ' এর বিবরণ পাওয়া যায়। দীর্ঘদিনের সেই প্রকৃত 'বাঙ্গালী' সংঙ্গাটি এ মহিলা আবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে। সে যথাযথই বলেছে; আমিও উনার সঙ্গে একমত যে, 'হিজাব, ঘোমটা ও দাড়ি-টুপিওয়ালারা আর যাই হোক বাঙ্গালী না'। ঘোমটা মাথায় গায়ের বধূ, খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা কখনোই 'বাঙ্গালী' নন। মহিলার এই বক্তব্যের পর মাথায় ঘোমটা দিয়ে বা হিজাব পরে কিংবা দাড়ি রেখে, মাথায় টুপি দিয়ে নিজেদের যারা 'বাঙ্গালী' দাবী করেন বা 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' এর তত্ত্বকথা শোনান, তাদের পরিচয় সংকটের অবসান ঘটবে। হয় তারা এখন থেকে আর নিজেদের 'বাঙ্গালী' দাবী করবে না, নয়তো নিজেদের ঘোমটা-হিজাব ও দাড়ি-টুপি বর্জন করবে!

ফাহাম আব্দুস সালাম লিখেছেন, '... আইডেন্টিটি ক্রাইসিসটা আপনার, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীর না- যেটা আপনি অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আপনার অল্প বুদ্ধি ও মেধার প্রায়শ্চিত্ত করেন। রাস্তাঘাটে আপনার মতো শাড়ি না পরা মেয়েদেরই শুধু আপনার চোখে পড়ে। কারণ এর বেশি কিছু দেখার জন্য যে সফিস্টিকেশান, প্রস্তুতি ও পড়াশোনো প্রয়োজন সেটা আপনার নেই। এই ঘাটতিকে আপনি পুষিয়ে নিতে চান শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে, বড় টিপ দিয়ে, ভান করে। আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারি, যে বিষয় নিয়ে আপনার অগাধ আস্থা, সেই বাঙালিত্ব নিয়েও আপনার তেমন কোনো পড়াশোনো নেই, জানাশোনো নেই।

দাড়ি-টুপি দেখলেই আপনি অস্বস্তিতে ভোগেন কেননা আপনি প্রগ্রেসিভ না ভীষণ ধরনের ট্রাইবাল মেন্টালিটির মানুষ। সবাইকে আপনার নিজের মতো না দেখলে মনে করেন যে সবকিছু হাতছাড়া হয়ে গেলো। আপনার আগ্রহ আসলে ‘আইল দেয়ায়’, নাহলে আপনি ইনসিকিউরড হয়ে পড়েন, তাই অভিযোগ সবাই কেন আপনার মতো না।

আপনি বাঙালিত্ব ও ইসলামকে এক সঙ্গে ধারণ করতে পারেন না, সাধারণ মানুষ যে এই সাধারণ কাজটা করতে সক্ষম সেটা আপনি বোঝেন না। এই দেশের মানুষ তার স্পিরিচুয়ালিটির ক্ষুধা মেটায় ধর্ম দিয়ে, সংস্কৃতির ক্ষুধা মেটায় বাঙালিত্ব দিয়ে। এ ধরনের কাজের কোনো হ্যান্ডবুক হয় না, তাই তাকে আপোস করতে হয়। কোনো সময় তার বাঙ্গালিত্বে খামতি হয়, কোনো সময় ইসলামে, বাট য়ু নো ওয়াট, ইট রিয়ালি ডাজন ম্যাটার মাচ। তারা আপনার মতো অলস সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির ঘ্যান ঘ্যান করা মানুষ না। তাদের কাজ আছে।

আপনিই আসলে সেকেলে ধারণার মানুষ, আপনার কাছে আইডেন্টিটির অনুষঙ্গ হলো কেবল শাড়ি পরা, পাঞ্জাবি পরা। এসবের কারণ হচ্ছে, এরচেয়ে গভীরে বুঝতে হলে যে মেধার প্রয়োজন হয় সেটা আপনার নেই। তারচেয়েও বড় কথা আপনি শিখেছেন শুধুই ঘৃণার ব্যবসা করতে। এই কাজ করতে কাউকে না কাউকে আপনার ইনফেরিয়র প্রমাণ করতে হবেই। যেহেতু আপনার জীবিকার জন্য দাড়ি-টুপিকে ছোটো করতে হয় সেহেতু আপনি দাড়ি-টুপিকে ছোটো করছেন। যদি জীবিকার জন্য বাঙালিত্বকে ছোটো

করতে হতো- আপনার যে মেধা- আপনি বড় বড় টিপ দেওয়া নিয়েই টিপ্পনি কাটতেন।

(দয়া করে মনে করবেন না আপনি যে বিরক্তি উদ্রেক করেন তার কারণ এই যে আপনি বাঙালিত্ব নিয়ে আপ্লুত এবং এ দেশে ইসলামের প্রসার নিয়ে উদ্বিগ্ন। আপনার অসহনীয় ঠেকে, কারণ প্লেইন এন্ড সিম্পল- আপনি একজন অল্প বুদ্ধি এবং খুবই অল্প পড়াশোনো জানা মানুষ।)’

এদিকে ফেসবুকে একজন (মওলা বাবা) ওই মহিলাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, ‘আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে;

প্রশ্ন ১- আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু মাথায় কাপড় দেন। তাহলে কি উনি বাঙালি না? তবে এই অবাঙালীকে প্রকাশ্যে এভাবে সমর্থন করছেন কেন?

প্রশ্ন ২- আমাদের বিরোধীদলীয় নেত্রীও কিন্তু মাথায় কাপড় দেন, তবে কি উনিও বাঙালি না?

প্রশ্ন ৩- মুক্তিযুদ্ধের কোনোও বীরাঙ্গনা যদি মাথায় কাপড় দেন তবে কি উনি বাঙালি থাকবেন না?

শেষ প্রশ্ন, কোনো পাকিস্তানি বা ভারতীয় যদি মাথায় কাপড় না দেয় তবে কি তারা বাঙালি হয়ে যাবে? উত্তর দিতে পারবেন?’

পাঠক ও সচেতন মহল অবশ্যই দুর্বৃত্তায়নের বাজারে মোটাবুদ্ধির অচলতা সত্ত্বেও কেবল ইসলামবিদ্বেষের কারণে কোনো মতে রুটি-

রোজগারে ব্যস্ত ওই মহিলার আসল পরিচয় উদ্ধার করে ফেলেছেন এবং পর্দা, হিজাব, দাড়ি-টুপিকে বাঙালিয়ানার সংজ্ঞার বাইরে ফেলে দেয়ার মাজেজাও সম্ভবত বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু কথা আছে না সব শিয়ালের এক রা? ফেসবুক ও যোগাযোগ মাধ্যমে এই মোটা বুদ্ধির মহিলার তীব্র সমালোচনা হতে শুরু করলে তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে আরেক 'মহাজ্ঞানী' ও 'বাঙালী বিশেষজ্ঞ' মডেল ও অভিনয়শিল্পী সোহানা সাবা। সে তার ফেসবুকে লিখেছে, বোরকা সেই দেশের পোশাক যেসব দেশে ভৌগোলিক কারণে নারী-পুরুষ সবাই জোব্বা পরেন। কিন্তু আর যাই হোক বোরকাধারীরা বাঙালি নন।'

দেশে আজ যে হারে বুদ্ধিজীবী, সংজ্ঞাবিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটছে, তাতে আগামী দশবছরের মধ্যে বাংলাদেশকে অভিধানের দেশ নামে আলাদা কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কিনা সেটা দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে!

সর্বস্বার্থে নারীর ব্যবহার ও বিভ্রান্তির রকমফের

পরহেজগারদের জন্য 'বোরকা পরা', উদারপন্থি যুবকের জন্য 'স্কিন টাইট তরুণী' ও বয়স্ক পাত্রের জন্য 'ডিভোর্সি মহিলা'। সব বয়সী ও সব পেশার লোকজনের জন্যই কনে আছে তাদের কাছে। আরও আছে লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা ও সুইডেন প্রবাসী অপূর্ব সব সুন্দরী। তাদের যেমনি রূপ, তেমনি যোগ্যতা। অভাব নেই চাকরি,

গাড়ি ও বাড়ির। চাইলে বিদেশ পাড়ি দিতে পারেন সহজেই। জয় করতে পারেন রাজ্যসহ রাজকন্যা। এমন লোভনীয় ও চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে যারাই গেছেন তাদের আস্তানায়, তারা ফিরেছেন নিঃস্ব হয়ে।

যত্রতত্র ও অপাত্রে ব্যবহার করে ধ্বংস করা হচ্ছে নারীর জীবন। সম্ভবত ব্যবসার বাজারে নারীই একমাত্র পণ্য, যা চিত্তাকর্ষক তো বটেই, সর্বত্র ব্যবহারযোগ্যও! ইসলাম ও শরীয়তে বিক্রিতপণ্যকে বলা হয় 'مال مبذول' অর্থাৎ বিক্রির কারণে সাধারণতই যা বিক্রেতার কাছে আগ্রহ ও কদরহীন বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। একারণে ইসলাম নারীকে কখনই শুধু 'মূল্যবান বস্তু' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি বরং 'অমূল্য সম্পদ' বলে আখ্যায়িত করেছে। এক হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

অর্থাৎ চরিত্রবান নারী হচ্ছে দুনিয়ার অমূল্য সম্পদ।' [মুসলিম : ১৪৬৭]

অমূল্য সম্পদ কাকে বলে? যা ছাড়া সমাজ চলে না, দেশ চলে না, পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষা হয় না অথচ তা বিক্রয়যোগ্য কিংবা বিক্রি হওয়ার মতো নগণ্য ও তাচ্ছিলযোগ্য নয়। যেমন, চন্দ্র-সূর্যের আলো, বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি। মানবজীবন ধারণের জন্য এগুলো অপরিহার্য কিন্তু তা ক্রয়বিক্রয়যোগ্য নয়। কেননা ক্রয়বিক্রয়যোগ্য

হলে ওই বস্তু আর অমূল্য থাকে না, মূল্যমানের হয়ে যায়। আর মূল্যমান মানেই ওই বস্তুর কদরহীন হওয়ার প্রমাণ। তাই ইসলাম নারীকে 'অমূল্য সম্পদ' বলে আখ্যায়িত করেছে, মূল্যবান বস্তু বলে আখ্যায়িত করেনি। আর এখানেই আঁতে ঘা লেগেছে ইসলামবিদ্বেষী বণিকচক্রের, যারা নারীকে নিছকই মূল্যমান বস্তু হিসেবে সব বাজারে তাদেরকে চালান করে দিতে চায়। অপাত্রে, কুপাত্রে বিক্রি করে নারীসম্ভ্রমকে চরমভাবে লঙ্ঘিত করতে চায়। আর ইসলামপন্থীরা নারীসৃষ্টের এই অবমাননার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে তারা রে রে করে ওঠে এবং জীবন বাঁচানোর কৌশল হিসেবে চোরের 'চোর গেলো' বলে চিৎকার করার মতো চিৎকার করতে থাকে। আফসোস, ইসলামের চোখে যে নারী অমূল্য সম্পদ, সেই নারীকেই যত্রতত্র ব্যবহার করে তাদের ইজ্জত-আব্রুকে ধূলিধুসরিত করা হচ্ছে। নারীকে আজ কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে না? অপাত্রে ব্যবহার করতে করতে নিয়ে আসা হয়েছে লাঞ্ছনাকর ও চরম ঝুঁকিপূর্ণ পেশায়। এর সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে ম্যারেজ মিডিয়া।

কিছুদিন আগে প্রতারিত এক যুবকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে র‌্যাব এধরনের এক প্রতারক চক্র শনাক্তে তদন্ত শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় র‌্যাব-১ এর একটি টিম রাজধানীর উত্তরা (পশ্চিম) থানাধীন ৫ নম্বর সেক্টরের ৫/এ নম্বর রোডের ৯ নম্বর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ভুয়া ম্যারেজ মিডিয়া সিন্ডিকেটের চার ভুয়া পাত্রীসহ ৮ জনকে গ্রেফতার করে। এই প্রতারক চক্রের বেশিরভাগ পাত্রীই যুবতী ও মধ্যবয়সী নারী। র‌্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে এই প্রতারক চক্রের

এক সদস্য হেনা জানায়, সে প্রতি মাসেই নতুন নতুন ক্লায়েন্টের বউ সাজে। পাত্র ধনাঢ্য হলে স্ত্রী হিসেবে রাত কাটায়। চাহিদামাফিক নগদ টাকা হাতে আসলেই হারিয়ে যায়। এভাবে এই পেশায় জড়িয়ে পড়ার দুই বছরে ২৩ জনের বউ হয়েছে। প্রত্যেক স্বামীর কাছ থেকেই লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আরো কষ্টের বিষয় হচ্ছে, হেনা অবিবাহিত নয়, খোকন মিয়া নামে তার আসল একজন স্বামীও আছে!

সূত্রমতে, বিজ্ঞাপন দেখে কোনো পাত্র যোগাযোগ করলে প্রথমেই জেনে নেয় তার পেশা। বেকার হলে চাকরি খুঁজছে কিনা। প্রবাসী পাত্রী বিয়ে করে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে কিনা। এমন প্রস্তাবে পাত্র দিশাহারা হয়ে পড়েন। বিয়ে করে বাইরে যেতে ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজি হন। প্রতারকচক্র তার পছন্দ মতো কনে সাজায়। বিয়ের খরচ, শাড়ি, স্বর্ণালঙ্কার, পাসপোর্ট, ভিসা ও এয়ার টিকিট বাবদ ৪-৫ লাখ টাকা নগদ নিয়ে নেয়। এরপর আয়োজন করে ভুয়া বিয়ের। কেউ মেয়ের চাচা, কেউ মেয়ের পিতা সাজে। আবার কেউ কাজী সেজে বিয়ে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু এক বা দুই দিনের মাথায় লাপাত্তা হয়ে যায় প্রবাসী স্ত্রী। স্ত্রীর মোবাইল ফোনে কল করে বন্ধ পান স্বামী। বুঝতে পারেন প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

র‌্যাব জানায়, ৩০ বছর বয়সী পারুল আক্তার। তার আসল স্বামী রুমি মিয়া। বাড়ি মাদারীপুর জেলার সদর থানার নতুন বাজারে। স্বামীকে ছেড়ে ভুয়া পাত্রী সেজে বসে থাকে। কখনও ডেইজি,

কখনও পরী ছদ্মনামে পাত্রের বিয়ের আসরে বউ সাজে। একইভাবে নরসিংদী জেলার রায়পুর থানার আবদুল্লাহপুর গ্রামের বিবাহিত শামসুন্নাহার (২৫) কুমারীর ছদ্মবেশে তরুণ পাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পাত্রের কাছ থেকে বিয়ের খরচ নিয়ে রাত যাপনের আগেই সটকে পড়ে। গত চার মাসে অন্ততপক্ষে তিন পাত্রকে ঠকিয়েছে সে। তার আসল স্বামীর নাম মানিক মিয়া।

প্রতারকচক্র সর্বকালেই যুগের বিদ্বান। তারা জানে কাকে কী তরিকায় ঠক খাওয়াতে হয়। তাই প্রতারক এই নারীরা পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী রূপ বদলায়, কথা পাল্টায়। যেমন, নাজমা বেগম। দাড়িওয়ালা হুজুরদের জন্য বোরকা পরে বসে থাকে পর্দানশীন এই নাজমা! কোরআন-হাদীসের দোহাই দিয়ে বারণ করেন রূপদর্শন। নেককার মহিলা তো! তাই প্রস্তাবদাতা পাত্রকেও চেহারা দেখানো নিষেধ!

এভাবে মুগ্ধ হন হুজুর পাত্র। হবু বধূর নেককারী-দীনদারীতে বর্তে যান। হুজুর পাত্র পটে গেলে বিয়ে পড়ান কাজী। রাতযাপনের আগেই মোহরানা পরিশোধের তাগিদ দিয়ে হাতিয়ে নেয় নগদ টাকা। কারণ নেককার পাত্রী তো! সবকিছুতেই শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দি। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নববধূ স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগেই কিংবা স্বামী-সম্পর্কের আগেই মহর দাবি করতে পারে এবং একারণে স্বামীকে নিবৃতও রাখতে পারে। সুতরাং দীনদার-নেককার নারী মহর আদায়েই বা শরীয়তের বিধান পালনে গড়িমসি করবে কেন?

বোকা 'হুজুর' নেককার পাত্রীর সব আব্দার মিটিয়ে যখন স্ত্রীর কাছে যান তখন জানতে পারেন এ তার স্ত্রী নয়! সে অন্যের ঘরণী এবং তার মতো বহু হুজুরের গত তিন বছরে অন্ততপক্ষে ১০টি 'ম্যারেজ মিডিয়া' নামধারী প্রতারক সিন্ডিকেট শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। পাকড়াও করেছে শতাধিক প্রতারক নারী ও পুরুষ সদস্যদের। র‍্যাব কর্মকর্তারা জানান, এ ধরনের ব্যবসাকে পুঁজি করে বিভিন্ন পত্রিকায় পাত্র-পাত্রী চাই- মর্মে চটকদারী বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তারা। তাদের এ প্রতারণার ফাঁদে পড়ে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির লোকেরা আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

'বিবাহ'র মতো পবিত্র সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধনকে পুঁজি করে রাজধানীতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে অসংখ্য প্রতারক চক্র। সেই চক্রতে দেদারছে ব্যবহৃত হচ্ছে অবলা নারী, বিপজ্জনক হয়ে উঠছে তাদের যাপিত জীবন। নানাভাবে প্রতারকদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে নারীসত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। এই প্রশ্নবিদ্ধ জীবন নারী কতদিন দীর্ঘ করবে, সেটাই দেখার বিষয়।

বিপন্ন নারীসত্তা ও সতীত্বের সওদার একটি গল্প

বাংলা একাডেমি ও একুশে পদক বিজয়ী লেখক হাসনাত আবদুল হাই ১৪-০৪-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক প্রথম আলোর অনলাইন সংস্করণে 'টিভি ক্যামেরার সামনে সেই

মেয়েটি’ শিরোনামে একটি গল্প প্রকাশ করেন। গল্পটির পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে পুরো গল্পটি পাঠ করে নেওয়া যাক।

মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে তার পেছনে পেছনে ঘুরছে, সেই অনুষ্ঠান শেষে হলঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে যখন তার চারদিকে ভক্ত ও তদবিরবাজদের ভিড়। এত ছেলেমেয়ের মাঝখানে সাদামাটা প্রায় ময়লা কাপড়ে উসর-ধূসর চুল মাথায় বিদ্ঘুটে রঙের সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটির প্রতি তার চোখ পড়ার কথা না, তবু পড়ল। এতে তিনি বিস্মিত হলেন এবং কিছুটা বিরক্তও। অনেকেই তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। কেননা, তিনি শুধু একজন সেলিব্রিটি নন, ইংরেজিতে যাকে বলে ফেভার। তা অন্যের প্রতি দেখানোর মতো তার যথেষ্ট ক্ষমতাও আছে। সেলিব্রিটির পেছনে ছেলেমেয়েরা ঘোরে মুগ্ধতার জন্য অথবা কিছু পাওয়ার আশায়। সংসারে সবারই কিছু না কিছু চাওয়ার আছে। জীবন যতই জটিল হচ্ছে, চাওয়ার তালিকা বেড়েই যাচ্ছে। চারদিকে প্রতিযোগিতার দৌড় জীবনকে আরও জটিল করে তুলছে।

মেয়েটি নাছোড়বান্দা, তিনি যতই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, সে ঘুরে এসে দাঁড়ায় সামনে, প্রথম সারিতে না হলেও দ্বিতীয় কি তৃতীয় সারিতে। দেখতে সে সুশ্রী নয়, তবে তার চোখে-মুখে তীক্ষ একটা ভাব আছে, নতুন ছুরির মতো। তার চোখের নিচে ক্লান্তির কালো দাগ, মুখে একধরনের রুক্ষতা। আগে সেখানে যে কমনীয়তা ছিল তা মুছে ফেলেছে। ঠোঁট দুটি চকচক করছে, যেন গ্লিসারিন

মাখানো। আসলে সে ঘন ঘন জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে। গলার নিচে কণ্ঠি বের হয়ে এসেছে, ওপরের দিকে গলার মধ্যে কয়েকটি ভাঁজ, সেখানে ঘামের পানি জমে আছে রুপার চিকন হারের মতো। শুকনো খড়ের মতো চুল উড়ছে বাতাসে। প্রায় ময়লা সবুজ ওড়না লাল কামিজে জড়ানো শরীরের ওপরে একটা স্তন ঢেকে রেখেছে, বুকের অন্য পাশে ওড়না কামিজের কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে রাখা, প্রায় সমতল দুই দিকেই, হঠাৎ দেখে ছেলে কি মেয়ে বোঝা যায় না। মেয়েটি বাংলাদেশের পতাকার রং দিয়েই সালোয়ার-কামিজ বানিয়েছে অথবা সেই রকম তৈরি করা কাপড় কিনেছে। আজকাল অনেকেই এভাবে কাপড় পরে, কিছুটা দেশপ্রেম দেখাতে, কিছুটা ফ্যাশন স্টেটমেন্টের জন্য। মেয়েটা দেখতে সুশ্রী না হলেও বয়সের জন্য একধরনের আকর্ষণ আছে তার শরীরে। অগোছালো বেশবাস সেই আকর্ষণে একটা বন্যতার ভাব সৃষ্টি করেছে, যেন সে যেখানে খুশি লাফিয়ে পড়তে পারে। দেখেই মনে হয় খুবই বেপরোয়া আর অ্যাগ্রেসিভ।

বুঝলেন স্যার, ওরা আমার সঙ্গে পলিটিকস করছে। সামনের সারিতে থাকতে দিচ্ছে না। অথচ এই কদিন আমি সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে থেকে স্লোগান দিয়েছি। আমার গলার স্বর এত উঁচু যে মাইক্রোফোনের বলতে গেলে দরকার হয় না। এক মাইল দূর থেকেই শুনে বুঝতে পারবেন এটা আমার গলার স্বর। মিটিংয়ের জন্য স্লোগানের দরকার, স্লোগানই মিটিং জমিয়ে তোলে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন। অভিজ্ঞ লোক আপনি। আমি কয়েক দিন মিটিং

জমিয়ে রেখেছি শুধু আমার গলার জোরে স্লোগান দিয়ে দিয়ে। কাগজে আমার নাম এসেছে। টেলিভিশনে আমাকে প্রায়ই দেখিয়েছে। পাবনা থেকে দেখে আমার ছোট বোন ফোনে বলেছে, আপু তোকে দেখা গিয়েছে। কয়েকবার। তুই খুব মাতিয়ে রেখেছিস। আমার মাও প্রশংসা করেছেন দেখে। কেন করবেন না? নিজের মেয়ের খ্যাতিতে কোন মা গর্ব অনুভব করে না? বাবা? না, তিনি কিছু বলেননি। বেতো রুগি, বিছানায় শুয়ে থাকেন সব সময়। শুনেছি, ছোট বোনকে বলেছেন, ও ঢাকা গেল পড়াশোনা করতে। এখন মিছিল-মিটিং আর মানববন্ধন করে সময় নষ্ট করছে। ওর পড়াশোনার কী হবে? জমির ভাই তো পড়ার কথা বলেই ওকে নিয়ে গেলেন ঢাকায়। এখন এসব কী হচ্ছে? ওর ভবিষ্যৎ আমার চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

জমির ভাই, মানে আমার বাবার অনাত্মীয় জমির সাহেবকে জানেন স্যার? আমরা তাকে চাচা বলি। তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা, মফস্বল শহর পাবনা থেকে শুরু করেছিলেন রাজনীতি, আস্তে আস্তে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঢাকায় পৌঁছেছেন। বাবার সঙ্গে জানাশোনা অনেক দিন থেকে। আগে প্রায় প্রতিদিন আসতেন, ঢাকায় আসার পর যান মাঝেমধ্যে। একদিন আমাদের বাসায় এসে বললেন, তোমার বড় মেয়েটা বেশ চটপটে আছে। ওকে ঢাকায় পাঠাও। মফস্বলে থেকে কত দূর আর যেতে পারবে? এখানে কি-ই বা সুযোগ রয়েছে? এখন সবই তো ঢাকায়।

ঢাকায় গিয়ে কী করবে সীমা? ওর তো গ্র্যাজুয়েশনও হয়নি। বাবা বলেছিলেন।

শুনে জমির চাচা উত্তর দিয়েছিলেন, কেন? ঢাকাতেই গ্র্যাজুয়েশন করবে। সেই ব্যবস্থা করে দেব আমি। কলেজ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জানাশোনা আছে। বললেই অ্যাডমিশন হয়ে যাবে। হোস্টেলেও জায়গা পেতে অসুবিধা হবে না। সবই তো রাজনৈতিক দলের কন্ট্রোলে, যখন যারা ক্ষমতায় থাকে, তাদের। এখন আমরা আছি, সব সিদ্ধান্ত আমরাই নিই। কে অ্যাডমিশন পাবে, কার জন্য সিট খালি করাতে হবে- এসবই আমাদের আওতায়। বুঝলেন না, একটা সিস্টেম তৈরি হয়ে গিয়েছে। বেশ সুন্দর চলছে। কেউ বাদ সাধছে না, কোনো হট্টগোল নেই। সবাই পাবে এই সুযোগ, পালা করে। বেশ গণতান্ত্রিক এই ব্যবস্থা। তা ছাড়া দলের কেউ না হলেও এসব সুযোগ পাওয়া যায়। একটু খরচ করতে হয় আর কি। সে যাই হোক, আপনার মেয়েটার দায়িত্ব আমি নিলাম। ও ঢাকায় যাবে, কলেজে ভর্তি হবে, হোস্টেলে থাকবে। পড়াশোনা করবে। মাঝেমধ্যে আমাদের পার্টি অফিসে এসে এটা-ওটা নিয়ে কাজ করে সাহায্য করবে।

কী কাজ করবে? কী নিয়ে সাহায্য করতে হবে সীমাকে? বাবার স্বরে উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা।

তেমন কিছু না। ধরেন নেতার জন্য বক্তৃতা লেখা, প্যামফ্লেট তৈরি, প্রচার পুস্তিকা লেখা, ব্যানারের স্লোগান এই সব আরকি। বড় ধরনের

কোনো কাজ না, জটিলও না। খুব বেশি সময় দিতে হবে না তাকে। পড়াশোনার কোনো ক্ষতি হবে না।

বাবা শুনে আমার দিকে তাকিয়েছেন। মাথা নেড়ে বলেছেন, ও অমন কাজ আগে কখনো করেনি। পারবে না। তা ছাড়া ওই সব নিয়ে থাকলে পড়াশোনা লাটে উঠবে।

জমির চাচা আশ্বাস দিয়ে বললেন, কাজগুলো সব সোজা। লেখালেখি, তা-ও বাংলায়। ছোট ছোট আকারে। তাতে সময় বেশি লাগবে না। আর পড়াশোনার সময় তো সে এসব কাজ করবে না, অবসরে করবে। সন্ধ্যার পর। কখনো রাতে।

সন্ধ্যার পর, রাতে? বাবা খুব চিন্তিত হয়ে তাকিয়েছেন জমির চাচার দিকে। বলেছেন মাথা দুলিয়ে কাঁপা গলায়, শুনেছি, সন্ধ্যার পর ঢাকার রাস্তাঘাট নিরাপদ না। গুন্ডা-বদমাশ ঘুরে বেড়ায়। ইভটিজার পিছু নেয়।

আরে না। ওসব বাড়িয়ে বলে লোকে। ঢাকা রাজধানী, সেখানে আইনশৃঙ্খলা থাকবে না তো থাকবে কোথায়? অন্য সব মেয়ে থাকছে না ঢাকায়? কাজ করছে না, ঘোরাঘুরি করছে না? মজার ব্যাপার কী জানেন?

কী? বাবার চোখে একরাশ কৌতূহল এবং পুরোনো প্রশ্ন।

ঢাকায় মফস্বলের মেয়েরাই বেশি ফ্রি, বেশি দুরন্ত, বেশ সাহসী। ওরা কাউকে পরোয়া করে না। সব পার্টিতেই তারা আছে। টেলিভিশনে

দেখেন না, মিছিলের সময় সামনে থেকে কেমন হাত তুলে জোরে জোরে স্লোগান দেয়। মফস্বলের মেয়েরাই ঢাকায় আন্দোলন জমিয়ে রাখে। বলতে গেলে ওরাই আসল কর্মী দল। ছেলেগুলো ফাঁকিবাজ। তারা মেয়েদের দিয়েই সব কাজ করিয়ে নিতে চায়। শুধু বাহবা আর টাকা নেওয়ার সময় সামনে থাকে। সব কাজের ক্রেডিট নেয়। জমির চাচা অনেকক্ষণ কথা বলে থামেন।

স্যার, কিছুই জানা ছিল না আমার, মফস্বলের মানুষ, তা-ও আবার মেয়ে। অল্প সময়ে অনেক কিছু শিখলাম। হয়তো আরও শেখার আছে। মেয়েদের সারা জীবনটাই জানার। ছাত্রী হয়েই থাকতে হয় সবকিছু জানার জন্য। অ্যাপ্রেন্টিস বলে না? আমরা হলাম তাই। কিন্তু আমি আর পারছি না স্যার। আমার একটা চাকরি দরকার। ভদ্রলোকের, ভদ্রমেয়ের মতো চাকরি। আপনি দিতে পারেন। আপনার তো সেই সুযোগ রয়েছে। আমার বেশি কিছু দেওয়ার নেই, সবই তো দেখতে পাচ্ছেন। প্রায় দেউলে হয়ে গিয়েছে শরীর আর মন। দেওয়ার মতো কিছু হয়তো একসময় ছিল, এখন তেমন কিছু নেই। মিথ্যে বলব কেন। আপনি অভিজ্ঞ লোক। সেলিব্রিটি।

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমার একটা দোষ আছে। তুমি বেশি কথা বল।

মেয়েটি শুনে মিইয়ে যায়। তারপর বলে, জমির চাচা কোথায়? আছেন, তিনি তার জায়গাতেই আছেন, দলের কাজ করছেন উঠে-পড়ে, দলে আরও কিছুটা ওপরে উঠতে পেরেছেন। অনেক

ফন্দিফিকির জানেন তিনি। কী করে ডিঙিয়ে যেতে হয়, ওপরের মানুষকে তুষ্ট করতে হয়, সব জানা আছে তার। তিনি আরও ওপরে উঠবেন।

আমি? না, আমার পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব হবে না। যেটুকু উঠেছি, ওই পর্যন্তই মানববন্ধন করি, মিছিলে যাই, মঞ্চ তৈরি করে তার ওপরে উঠে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিই। টেলিভিশনে দেখায়। কাগজে নাম ছাপা হয়। পাবনা থেকে ছোট বোন প্রশংসা করে ফোনে জানায়। মা-ও খুশি, তার মেয়েকে টেলিভিশনে দেখা যাচ্ছে, সবাই তার কথা বলছে। মা আমাকে নিয়ে গর্ব করেন বলে শুনেছি।

পড়াশোনা? হ্যাঁ, জমির চাচা তার কথা রেখেছিলেন। কলেজে অ্যাডমিশন হয়েছে। হোস্টেলে শেয়ারে সিট পেয়েছি, মানে দুজনে একসঙ্গে থাকতে হয়। ক্লাস বেশি হয় না, প্রায়ই বন্ধ থাকে। আমরাও ফুরসত পাই না। হরতাল, মিটিং, মিছিল। মঞ্চে উঠে স্লোগান দেওয়া। এতে অনেক সময় চলে যায়। তবে কলেজে নামটা আছে খাতায়। হোস্টেলে সিটটা আছে এখনো। কেউ আপত্তি করে না, কেন করবে? প্রায় সবাই তো আমার মতো অবস্থার। কারও অনুগ্রহে অ্যাডমিশন আর সিট পাওয়া। সন্ধ্যার পর পড়াশোনা? না, সেটা প্রায় কারোরই হয় না। সবাই কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত, টাকার ধান্দায় ঘোরে। আমি পার্টি অফিসে যাই। কখনো একা, কখনো ছাত্রনেতাদের সঙ্গে। জমির ভাইয়ের অফিসে বসে বক্তৃতা লিখি, কখনো লিফলেট। কম্পিউটারে প্রিন্ট আউট বের করে দেখাই। তিনি প্রুফ দেখে দেন। আবার টাইপ করি। এসব কাজ ছেলেরা করতে

চায় না। তারা মারধর, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, ভাঙচুর- সব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কাজ শেষ হলে আড্ডা দেয়, ড্রিংক করে একসঙ্গে বসে।

ড্রিংক? না, না। চা-টা না। অ্যালকোহল। হুইসকি। বিয়ার। আমাকেও খেতে হয়েছে পাল্লায় পড়ে। ওদের সঙ্গে থাকতে হলে তাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য নানাভাবে সঙ্গ দিতে হয়। এড়ানোর উপায় নেই। ওরা নেতাদের কাছে নালিশ করলে আমাদের ভাতা বন্ধ। দেড় হাজার টাকা ভাতা পাই আমি অফিস থেকে, তাই দিয়ে কলেজে পড়া, হোস্টেলে থাকা। খুব মূল্যবান সেই ভাতা। বোকামি করে হারাতে পারি না। তাহলে যে পথে বসব।

জমির ভাইকে বলোনি কেন এসব? কী যে বলেন! তিনি কি ধোয়া তুলসি পাতা? তিনিও ড্রিংক করেন। রাতে কাজ শেষ হয়ে গেলে অফিসে বসেই করেন। আমাকেও খেতে হয়েছে তার সঙ্গে। আদর করে জড়ানো গলায় বলেছেন, খাও, খাও। ভালো জিনিস। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এনার্জি বাড়ায়। এত পরিশ্রম করার পর দরকার আছে এটার। সাহেবরা তো খারাপ জিনিস তৈরি করেনি। অল্প অল্প খাও, তাহলে বেসামাল হবে না। একটু সামলে চলতে হবে, হাজার হোক এটা পার্টি অফিস। বেসামাল হতে চাও তো আমার বাসায় এসো। তোমার ভাবি? আরে সে থাকলে তো! কেউ নেই, বাসা খালি। মারা গিয়েছে? না, মারা যাবে কেন? মেয়েরা অত তাড়াতাড়ি মরে না। এই ঝগড়া করে চলে গেল আরকি। বলল, রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ঘর করা পোষাবে না তার। কয়েক বছর একসঙ্গে থাকার পর এই কথা বলা। এত দিন যখন সহ্য করতে পেরেছে, তখন বাকিটাও পারত।

কোনো মানে হয় হঠাৎ করে এসব কথা বলার? যারা দেশের জন্য খাটছে দিন-রাত, তাদের কিছু খামখেয়ালি, নিয়ম ভেঙে চলা এসব সহ্য করতে না পারলে চলবে কেন? শুনল না মেয়ে মানুষটা। চলে গেল। যাক গে। বেশ আছি। হাত-পা ঝাড়া। চাকর আছে, রাঁধুনি আছে বাসায়। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে না, ঘুমোবার সময় বেশ ঘুমোচ্ছি। হ্যাঁ, তোমার যখন খুশি যেতে পারো। ওদের বললেই তোমাকে খেতে দেবে। দোকানে দোকানে সব সময় খাওয়া ভালো না লাগারই কথা। সেই তো বিরিয়ানি, নয়তো পরোটা-গোশত। কত দিনের পুরোনো কে জানে। স্বাদ বদলের জন্য এসো আমার বাড়ি মাঝে মাঝে। যখন খুশি। আমি বলে রাখব। জমির চাচা বললেও আমি সঙ্গে সঙ্গে তার বাসায় যাইনি। আমার মনে বেশ সন্দেহ জমেছিল। আস্তে আস্তে লোকটার চেহারা খুলে যাচ্ছিল আমার সামনে।

জমির চাচা নিজেই একদিন নিয়ে গেলেন তার বাসায়। প্রায় জোর করেই ড্রিংক করালেন ড্রয়িংরুমে বসে। সেদিন বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তারই চাপে। ড্রিংকের পর পোলাও-কোর্মা খাওয়া হলো। খুব ফুর্তি লাগছিল। অমন মজা করে খাইনি অনেক দিন। তিনি যখন অনেক রাতে বললেন, দেরি হয়ে গিয়েছে। এখন হোস্টেলে যাওয়া ঠিক হবে না। থেকে যাও এখানে।

তাকে বেশি করে বলতে হলো না। থেকে গেলাম প্রায় স্বেচ্ছায়। সেই শুরু। তারপর বেশ কয়েক দিন হয়েছে অমন, একসঙ্গে ড্রিংক করা, খাওয়া আর ঘুমানো। দলের ছেলেরা তো বোকা না, টের পেয়ে

গিয়েছে। ঠাট্টা করেছে, মিসট্রেস বলে। গায়ে মাখিনি। এমন ভাব করেছি, যেন শুনতেই পাইনি। ওরা ঠাট্টা করা বন্ধ করেনি।

জমির চাচাকে কেন বলিনি ওদের কথা? এই জন্য বলিনি যে জমির চাচা ওদের কিছু বলবেন না। তাদের নিয়ে কাজ করতে হয় তাকে।

তিনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন, অনেক জায়গাজুড়ে মঞ্চ। রাস্তায়, ফুটপাতে মানুষের ভিড়। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েই বেশি। স্লোগান উঠছে থেকে থেকে, কোলাহল বাড়ছে। তিনি সীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি মঞ্চে যাবে না আজ? স্লোগান দিতে?

না। ছাত্রনেতারা পলিটিকস করছে আমার সঙ্গে। বলছে, তাদের খাদ্য হতে হবে। শুধু জমির চাচার একার খাদ্য হলে চলবে না। রাতের বেলা মঞ্চের আশপাশে তাদের সঙ্গেও শুতে হবে। তাহলেই হাতে মাইক্রোফোন দেবে, নচেৎ নয়।

শুনে তিনি অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকান। রাস্তার স্লোগান ক্রমেই জোরালো হয়। তিনি সীমা নামের মেয়েটিকে বলেন, মাইক্রোফোন ওরা কন্ট্রোল করে? ওরাই ঠিক করে কে কখন স্লোগান দেবে?

তা নয় তো কী? ওরাই তো মঞ্চের নেতা। ওদের কথা যারা মানবে না, তারা হাতে মাইক্রোফোন পাবে না। গলা যত সুন্দরই হোক। আমার মতো ভরাট গলা হলেও চান্স পাবে না। মেয়েটি হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বলল, শুনবেন স্যার? একটা স্লোগান দেব? আমার ভরাট গলায়?

না, না। দরকার নেই। এমনিতেই বুঝতে পারছি তোমার গলা বেশ ভরাট। রেডিও, টিভি অ্যানাউন্সারদের মতো, নিউজ রিডারের মতো।

মেয়েটি খুব খুশি হয় শুনে। হাসিমুখে বলে, সত্যি বলছেন স্যার? টিভি অ্যানাউন্সার, নিউজ রিডারের মতো? বলতে বলতে মেয়েটির চোখ ভিজে এল। ধরা গলায় বলল, আমার মতো অধঃপতিত মেয়ের ভাগ্যে কি তা হবে কখনো? হতে পারত যদি খারাপ হয়ে না যেতাম। ভালো পথে চলতাম। ভালো লোকের সঙ্গে মিশতাম। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? আমার মতো অবস্থার একটা মেয়ে ভালো পথে কী করে চলবে? ভালো মানুষের সঙ্গ সে কোথায় পাবে? হাজার চেষ্টা করলেও তা হবে না। পাবনা থেকে ঢাকা অনেক দূরের পথ। আমি তো জানি পথের বাধাগুলো কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে। না, অত বড় কিছুর কথা ভাবতে পারি না আমি এখন। ছোটখাটো একটা চাকরি পেলেই বর্তে যাব। যেকোনো কাজ, যা ভদ্রভাবে চলতে দেবে, সুন্দরভাবে থাকতে দেবে। আচ্ছা স্যার, আপনার টেলিভিশন চ্যানেলে লেখাটেখার কোনো কাজ নেই? আমি খুব ভালো বাংলা লিখি। কবি শামসুর রাহমানের ওপর লেখা আমার কয়েকটা প্রবন্ধ আছে। অনেকে প্রশংসা করেছিল। আরও কয়েকটা লিখে একটা বই বের করব ভেবেছিলাম। কিন্তু সময় হলো না। ইচ্ছেটা এখনো আছে।

জমির চাচাকে বলব? তিনি উড়িয়ে দেবেন কথাটা। বলবেন, কবি-টবিদের ওপরে বই লিখে কী হবে? তার চেয়ে আমাদের দলের ওপর লেখো। দলের নেতাদের ওপর লেখো। তারপর একটু থেমে বলেছেন, তোমার অসুবিধা কোথায়? এই সব কথা তোমার মাথায়

ঢোকে কেন? মাসে তিন হাজার টাকা পাচ্ছ। সেই টাকায় কলেজের ফি, হোস্টেলের খরচ দিচ্ছ। এই বয়সে এর চেয়ে ভালো চাকরি আর কী হতে পারে? তাও আবার পার্টটাইম। পরীক্ষায় পাস করার পর বেশি বেতনে চাকরি পেয়ে যাবে, তখন তুমি শুধু শামসুর রাহমান কেন, সব কবিদের নিয়ে লিখবে। এখন তোমাকে আমার অফিসের কাজের জন্য বেশি দরকার। ছাত্রনেতারা হাসি-ঠাট্টা করে? তা একসঙ্গে করলে বন্ধুরা অমন করবেই, গায়ে না মাখালেই হলো অথবা হেসে উড়িয়ে দেবে। আর শোনো, আমাকে না বলে ছাত্রনেতাদের সম্পর্কে কিছুই বলতে যাবে না। ওরা রেগে গেলে সবকিছু করতে পারে। দল ভেঙে অন্য কোথাও যাওয়ারও চেষ্টা কোরো না। দলের ছেলেরা সেটা সহ্য করবে না। ওরা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলবে। দলের ছেলেমেয়েদের দলে রাখা তাদের জন্য একটা প্রেসটিজের ব্যাপার। ইচ্ছে করলেই কাউকে চলে যেতে দেওয়া যায় না। ঢোকা সহজ, বেরোনো কঠিন। বুঝলে? মাথা ঠিক রেখে কাজ করো। সমস্যা হলেই আমার কাছে চলে আসবে, খোলাখুলি সব বলবে।

জমির সাহেব মঞ্চের ছেলেদের বলছেন না কেন তোমাকে মাইক্রোফোন দেওয়ার জন্য? তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেন।

বলছেন না এই জন্য যে তিনি তাদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে চান না। তা ছাড়া ব্যাপারটা নাটকের মতো। পেছন থেকে প্রম্পটার যা বলছে, তাই নিয়ে স্লোগান হচ্ছে, সে অনুযায়ী সবকিছু চলছে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। জমির চাচা মঞ্চের পেছন থেকে সামনে

আসতে যাবেন কেন? তিনি এবং তার বন্ধুরা টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, খাওয়ার প্যাকেট পাঠাচ্ছেন। মঞ্চ চালু থাকছে, মিছিল বের হচ্ছে। ব্যস, এতেই তারা সন্তুষ্ট। একটা মেয়ের জন্য তিনি কিংবা তার সহকর্মীরা ছাত্রনেতাদের খেপাতে যাবেন কেন? নিজের দুর্বলতা থাকলে এমনই হয়। না, জমির চাচাকে বলে কিছু হবে না। সে আমার জানা আছে। হাতে মাইক্রোফোন পাওয়ার একটাই উপায়। ছাত্রনেতাদের কথা শুনতে হবে। সোজা কথায়, তাদের খাদ্য হতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আমার মতো মেয়েরা সবাই খাদ্য। তারা মেনে নিয়েছে, ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়। কী করবে? বাবার এত টাকা নেই যে তার খরচে ঢাকায় থাকবে। চাচা নেই, মামা নেই যে সাহায্য করতে পারেন। একমাত্র জমির চাচারা আছেন। তারা আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে আসেন। বড় মিষ্টি তাদের ব্যবহার। প্রায় অপত্যস্নেহে তারা সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন।

মেয়েটি প্রসঙ্গ বদলায়। বলে, আপনাকে টেলিভিশনে দেখেছি, টকশোতে আপনার কথা শুনেছি। আপনাকে অন্য রকম মনে হয়েছে। মানে অন্য পুরুষদের মতো না। আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু সত্যিই আপনাকে দেখে আমার এমন মনে হয়েছে। তা স্যার, পারবেন আমার জন্য কিছু করতে? বড় কিছু না। মঞ্চের আড়ালেই থাকব, লেখালেখি কিছু থাকলে করে দেব। টেলিভিশনেও লেখার কাজ নিশ্চয়ই আছে?

এই বইটা থেকে পড়ব? কতটুকু? এক প্যারা? বেশ পড়ছি। বলে মেয়েটি পড়তে থাকে এক মনে। পড়া শেষ হলে সে তাকে বলে,

ক্যামন হলো স্যার? স্লোগান দিয়ে দিয়ে গলাটা ভেঙে গিয়েছে। নরমাল হলে আর একটু ভালো হতো। তা লেখালেখির কাজের জন্য তো গলার স্বরের দরকার নেই। আমার লেখা প্রবন্ধগুলো আপনাকে দেব। কবি শামসুর রাহমানের ওপর লেখা প্রবন্ধ। আমার খুব প্রিয় কবি ছিলেন। ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতাটি পড়লেই আমার গায়ের রোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়।আমি প্রবন্ধগুলো আপনার অফিসে গিয়ে দিয়ে আসব। আপনার কাছে পৌঁছাবে কি না কে জানে। কত রকমের সিকিউরিটি আপনাদের অফিসে। তবু আমি দিয়ে আসব।

তিনি পকেট থেকে মোবাইল বের করে চোখের সামনে নিয়ে একটা নম্বরে টিপ দিলেন। তারপর ওপাশে কণ্ঠস্বর শোনা যেতেই তিনি বললেন, একটা মেয়ে যাবে অফিসে। নাম সীমা। ওর একটা অডিশন নেবে। হ্যাঁ, সে একটা কিছু পড়ে যাবে, যা তোমরা তাকে দেবে। শোনার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। তারপর আমাকে তোমাদের মত দেবে। হ্যাঁ, আমিও শুনব তার রেকর্ড করা অডিশন।

স্যার, আমি টেলিভিশনে অডিশন দেব? সত্যি বলছেন? না, না ঠাট্টা করবেন না আমার সঙ্গে। আমি এর মধ্যেই জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। আর বাড়াতে চাইনে কষ্টের বোঝা। স্যার, চাকরি না দেন, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবেন না। আমি মফস্বলের সামান্য একজন মেয়ে, তার ওপর আবার অধঃপতিত। পড়ে গেলে নাকি ওঠা কঠিন। আমি একটু দেখতে চাই, পড়ে গেলেও ওঠা যায় কি না, তার জন্য ছোট একটা সুযোগ দেন শুধু।

তিনি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি খুব বেশি কথা বল।

শাহবাগ চত্বর লোকে লোকারণ্য। সব বয়সের মানুষ নর-নারীতে ভরে গিয়েছে সব রাস্তা, ফুটপাত। সবাই ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে আছে দক্ষিণের দিকে, যেখানে জাতীয় জাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরি আর তারপর আর্ট ইনস্টিটিউট। হকাররা ভিড়ের মধ্যে নানা ধরনের জিনিস বিক্রি করছে। খেলনা, খাবার জিনিস সবই। লাল আর সাদা হাওয়াই মিঠাইয়ের পেজা তুলার মতো ফাঁপানো শরীর প্লাস্টিকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাবার কাঁধে চড়ে একটা শিশু হাওয়াই মিঠাই খাচ্ছে, কাঁধে চড়েই কেউ বাতাসে খেলনা নাড়ছে। বাঁশি বাজাচ্ছে এক হকার, গলায় ঝোলানো ঝোলায় বিক্রির বাঁশি। শুকনো মিষ্টি বিক্রি করছে ঠেলাওয়ালা। বাতাসে ভাজা-পোড়ার গন্ধ। শিশুপার্কের সামনে এক চিলতে জায়গায় ফকির আলমগীর তার দল নিয়ে লালনসংগীত গাইছেন ফিউশন সুরে।

একটু পরে আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে ঢেউয়ের মতো একটা চঞ্চলতা আছড়ে পড়ল। পেপিয়ার-ম্যাশে তৈরি মস্ত বড় বাঘ, প্যাঁচা, ময়ূর মাথার ওপরে তুলে এগিয়ে আসছে শোভাযাত্রার ছেলেমেয়েরা। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে যেন, চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভিড়ের মানুষ। গরমে ঘামছে সবাই, লাল হয়ে এসেছে মুখ। ধুলো উড়ছে, বাতাসে রোদের ঝাঁজ।

মেয়েটি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে বলছে, ‘নতুন বর্ষকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে আসছে মঙ্গল শোভাযাত্রা।

এতক্ষণ যারা অধীর প্রতীক্ষায় ছিল, হাজার হাজার সেই সব নর-নারী শিশু-কিশোরের প্রতীক্ষা শেষ হলো। গান শোনা যাচ্ছে, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।' বলতে বলতে মেয়েটির স্বর ক্রমেই উঁচু হলো। এত কোলাহল, গানের চড়া সুর, তার ভেতরে মেয়েটির কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সে পরেছে লাল পেড়ে সাদা সুতির একটা শাড়ি। তার এক হাতে ছোট গাঁদা ফুলের মালা বালার মতো জড়িয়ে।

[তথ্যসূত্র : একটি ফেইসবুক পোস্ট থেকে সংগৃহীত]

প্রথম আলোর নববর্ষ সংখ্যায় লেখক হাসনাত আব্দুল হাই রচিত 'টিভি ক্যামেরার সামনে মেয়েটি' শীর্ষক এই গল্পটি প্রকাশের পর থেকেই একশ্রেণির পাঠকমহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ওই শ্রেণির পাঠকদের এমন প্রতিক্রিয়া পেয়ে পত্রিকাটি গল্পটি প্রত্যাহার করে নেয় এবং গল্পটি প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। ১৬ এপ্রিল পত্রিকাটির চিঠিপত্র কলামে বেশ কয়েকটি চিঠি ছাপানো হয় যা পড়ে গল্পটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কয়েকটি কারণ তুলে ধরছি :

১. গল্পটি প্রতিক্রিয়াশীলদের ভিত্তিহীন অপপ্রচারের ভাষায় রচিত।

২. বাংলাদেশের নারীদের প্রতি মারাত্মক অবমাননাসূচক।

৩. এই গল্প এমন একসময় প্রকাশ করা হয়েছে যখন একটি সংগঠন নারী প্রগতির বিরুদ্ধে অগ্রহণযোগ্য দাবী তুলেছে।

৪. গল্পটি প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকে আরো উৎসাহিত করবে।

৫. লেখাটির রচনাভঙ্গির কারণে এটি সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট নারী রাজনৈতিক কর্মীর প্রতি ইঙ্গিতবাহী।

৬. এই গল্পটি বর্তমান দুঃসময়কে আরো অন্ধকার করে তুলবে।

৭. এই গল্পটিতে সাম্প্রতিক প্রগতিশীলদের আন্দোলনকে খুবই অরুচিকর ও অন্যায্যভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত যুক্তিগুলোর প্রায় সবটিই 'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাই না'র মতোই অপরাধীর ইঙ্গিতবাহী প্রশ্নে নিজের দোষ স্বীকার করার মতোই ব্যাপার। কেননা গল্পটি নিরপেক্ষভাবে পড়লে বুঝা যায়, লেখক আসলে আমাদের এ সমাজে ভালো একটা কাজেও মেয়েদেরকে যে কতোটা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসতে হয় তারই একটা নগ্নরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এমন লেখা আমাদের সাহিত্যে এটাই নতুন নয়। যুগে যুগে শত শত কবি-সাহিত্যিক তাদের লেখায় বিষয়টা তুলে ধরেছেন। হুমায়ূন আহমেদের এপিটাফ নামের উপন্যাসে আমরা দেখেছি এক মা তার মেয়ের চিকিৎসার টাকা তুলতে নিজেকে তুলে দিয়েছেন তারই এক বিত্তশালী দুলাভাইয়ের হাতে। মিলান ফারাবী নামক এক লেখক তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীর আত্মকথা' বইটিতে বাস্তব উদাহরণে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, একজন অভিনেত্রী এক জনপ্রিয় নাট্যকারের নাটকে অভিনয়ের সুযোগ

পাওয়ার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা স্বরূপ শিকার হয়েছিলেন সেই নাট্যকারের। খুব সম্প্রতি অভিনেত্রী অমৃতা খানের পরিচালক এপি কাজল কর্তৃক শিকার হওয়ার ঘটনা এবং কাজলের মুখে অসংখ্য নায়িকার শিকার হওয়ার কাহিনী মিডিয়ায় ব্যাপক ঝড় তুলেছে। নারীর প্রতি চরম অবমাননাসূচক এসব লেখায় খুব ঘৃণ্যভাবেই বাস্তবতাটাকে তুলে ধরা হয়েছিল। এরকম আরো ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যাবে এমন অবমাননার।

লেখক তার গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করেছেন ইসলামের পর্দা বিধান ও আলেম-উলামার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংগঠিত একটি আন্দোলনের বিরুদ্ধে। আর একারণেই সবাই ভাবছেন এটা নির্দিষ্ট কোনো নারী কর্মীকে নিয়ে লেখা হয়েছে। কিন্তু একজন গল্পকারের চরিত্রের নামের সঙ্গে আপনার নামটি মিলে গেলে আপনি যদি মনে করেন সেটা আপনাকে নিয়েই লেখা, তবে এ যে ভীষণ বোকামী হবে- এটা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে আমাদের এটাও ভুলে গেলে চলবে না কোনো অপপ্রচারে বিহবল হয়ে যদি তুমুল প্রতিক্রিয়া জানানো হয় তখন অপপ্রচারকারীরা আরো শক্তি পায়। আলেম-উলামা নারীর পর্দা ও ইসলামের আদর্শের সপক্ষে যে দাবি তুলেছেন তা এ গল্প প্রকাশিত হবার আগেই তুলেছেন। এ গল্প প্রকাশে বা প্রকাশ পরবর্তী প্রত্যাহারে আমার মনে হয় না তাদের মনোজগতে কোনো প্রভাব ফেলবে।

বস্তুত নারীবাদীরা এই গল্পকে ওই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক মেয়ের গল্প বলে প্রতিবাদ করলেও বাস্তবেই ফুটে উঠেছে আমাদের

বিপন্ন নারীসত্তার ভগ্নদশার চিত্র। লেখক এখানে অপারগ। কারো কারো দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বাস, আদর্শ ও ভাবনার ক্ষেত্রে হাজার দোষে অভিযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু অন্তত এই ক্ষেত্রে তার কলম থেকে সমাজচিত্রের বাস্তবরূপটাই বের হয়ে এসেছে। তবে এক্ষেত্রে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, পাপ কিংবা পাপীকে ঘৃণা করা হয় না; ঘৃণা করা হয় প্রকাশকারীকে! এমনটাই দেখলাম আমরা লেখক আবুল হাসানাত আবদুল হাই সাহেবের ক্ষেত্রে। কেন তিনি সমাজ নিংড়ানো একটি তিক্ত সত্য প্রকাশ করলেন তা নিয়ে ব্লগার ও নিষিদ্ধসুখে উল্লসিত ভ্রান্ত তরুণ-যুবকগোষ্ঠী সমালোচনার কল্কে এক সঙ্গে ধুয়া ছেড়ে গলা খাকাড়ি দিতে শুরু করল!

ভ্রষ্ট এই তরুণরা প্রতিবাদ করলেও তারাই যে গরল উদ্গীরণকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজনীতির চাণক্য সাফল্যের জন্য যুগ যুগ ধরে যে নারীরা ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা কোন্ মুখে এরা অস্বীকার করে? ঢাকায় পাড়ি দেওয়া গ্রামের সহজ-সরল শিক্ষার্থীকে রাজনীতিবিদরা কি তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে না? কিংবা ব্যবহার করে না তাদের যৌনলালসা মিটানোর কাজে? বেশ কয়েক বছর আগে রাজধানীবাসীর গর্ব করার মতো নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বদরুন্নেছা, ইডেন কলেজের মেয়েদের রাজনৈতিক নেতাদের যৌন লালসার শিকার হওয়ার সংবাদ আসেনি? সেই বাস্তব ঘটনাগুলোকে লেখকের কল্পনার ভাষায় তুলে আনলে দোষ কী?

বস্তুত দেশে আজ গণতন্ত্রের নামে অনেক কিছুই হচ্ছে। গণতন্ত্র কতটুকু স্বার্থক তন্ত্র সে তর্কে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয়

আজকের বাস্তবতায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। যে দেশে, যাদের জন্য যে কাজ সুবিধা সেটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের কার্যকর সংজ্ঞা। গণতন্ত্রের সংজ্ঞার ওপর কারো যে আস্থা নেই সে কথা বলাবাহুল্য। কিন্তু এরচেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে গণতন্ত্রের নামে স্বার্থতন্ত্রে নারীসত্তা জবেহ হয়ে যাচ্ছে। একজন লেখকের মধ্যে একটা 'লেখকসত্তা' জীবিত থাকে। হয়ত সেটা কারো বেলায় কখনও কখনও ঘুমিয়ে থাকে কিংবা যে কোনা পারিপার্শ্বিক কারণে তা প্রকাশিত হতে বিঘ্ন হয়। কোনো লেখকের সেই জীবন্তসত্তা তার পরিচালিত জীবনবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেই মানুষ হইচই বাঁধায় এবং পাঠকমহল অবাক হয়। 'টিভি ক্যামেরার সামনে সেই মেয়েটি' গল্পটা সমস্যা তৈরি করেছে ঠিক এখানেই। লেখক আবুল হাসনাত যে মহলের মানুষ সেই মহল থেকে এধরনের একটি জ্যান্ত সত্য প্রকাশ অনেককেই বিস্মিত করেছে। আমার ধারণা, যারা এই গল্পের সমালোচনা ও নিন্দা করেছে তারা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই করেছে।

সময়ের বিবসনা কুইন আজ এহরামবস্ত্রে সুশোভিত

অভিশপ্ত শয়তান ও তার দোসররা বহু নারীকে বিবসনা করার চক্রান্তে সফলতা দেখালেও অনেক ক্ষেত্রে এসে তাদের চাল উল্টো

তাদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে এমন নারী পর্দার ভেতরে ফিরে পেয়েছেন তাদের মর্যাদা ও সম্মান, যারা ছিলেন সময়ের তরুণ-যুবকদের চোখে স্বপ্নের নারী। যাদের ভক্ত হয়ে থাকায় তারা পুলকিত হতো, বিয়ের বর হওয়ার চেয়ে এসব অভিনেত্রী-নায়িকাদের ভক্ত হয়ে থাকাতে বেশি শিহরণ ও পুলক অনুভব করে। তাই এসব অভিনেত্রীর বিয়ের সংবাদে ভক্তদের হৃদয় ভাঙে, কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে বসে। লক্ষ যুবকের হৃদয়বাসনার এমনি এক রাণী কুইন পাডিল্লা। কিছুদিন আগে ফিলিপিনো অভিনেত্রী কুইন পাডিল্লা (Queenie Padilla) শোবিজ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ABS-CBN সংবাদের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ইসলাম গ্রহণ করে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা। আপনি যখন মুসলিম হবেন তখন জানবেন জীবনের সত্যিকার উদ্দেশ্য কী। আমি একজন পাপী ব্যক্তি। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার গৃহে আমাকে দাওয়াত করেছেন। সুতরাং, আমি এখন আল্লাহর খুব নিকটে।'

সম্প্রতি তিনি মক্কাতে হজ পালন করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে তিনি এখন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। তিনি স্বীকার করেন, যখন আমি শোবিজে ছিলাম, তখন আমি অসুখী ছিলাম। আমি কি যেন হারিয়েছিলাম। তাই কখনই চিরন্তন সুখ অনুভব করতাম না। এখন, আল্লাহ আমার জীবন, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন। আমি এখন সুখ এবং জীবনের উপাদান পেয়ে গেছি।'

যেহেতু তিনি তার জীবন উপভোগ করছেন আর শোবিজ ছিল হারাম কাজ। সেহেতু তিনি আর শোবিজে ফিরে যাবেন না।

তিনি তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণে ও হজ পালনে সাহায্য করায় তার আবেগাপ্লুত অবস্থায় বাবা অ্যাকশন স্টার Robin Padilla কে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, তার বাবা তাকে সুযোগ না করে দিলে হয়ত তিনি মুসলিম হতে পারতেন না। [ম্যানিলা, ২০ নভেম্বর, ২০১৩]

নগ্নতাই যেন নারীর বাঁচার শেষ অবলম্বন?

কতটা রিয়্যাল হতে হবে রিয়্যালিটি শো-কে? বাস্তবতার ঠিক কোন পর্যায়ে সুড়সুড়ি দিলে তবে রিয়্যালিটির রংচঙে মোড়কের প্রতিটি রেখা তুলে ধরবে এর তীক্ষ্ণ দাঁত-নখ? রিয়্যালিটি শোর ঝলমলে স্টেজ ঝাঁপিয়ে পড়বে সাধারণ মানুষের বাস্তবজীবনের ওপর? রিয়্যাল, আরও রিয়্যাল। মানুষের সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারটুকু খোলা মঞ্চে হাজির না করলে কীসের এই রিয়্যালিটি শোর তকমা! তাই নাচ-গান-অভিনয়-লোক হাসানোর ক্ষমতা বা বাইরের দুনিয়ার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এক বাড়িতে ক্যামেরা-বন্দি হয়ে অনেকে মিলে দিন কাটানো নয়, খোলা মঞ্চে নগ্ন নারী শরীর এবার রিয়্যালিটি শোর উপজীব্য। কারণ এই মুখোশ পরা ভদ্র মানুষগুলোর কাছে সব পণ্যের সেরা পণ্য নারীর দেহ। ভোগ্যপণ্যের বাজারে সবচেয়ে চড়া দামে যা বিকোয়, মাথা খাটিয়ে সেটাকেই রিয়্যালিটি শোর বিষয় করেছেন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা।

খবরটা প্রকাশ পায় বিবিসির ওয়েবসাইটে। সংবাদে বলা হয়, ডেনমার্কের ওই রিয়্যালিটি শোর কথা। সে দেশের টিভি চ্যানেলের প্রাইম টাইমে দেখানো হচ্ছে ‘নেকেড লেডি’ নামের এই রিয়্যালিটি শো। সেখানে মঞ্চে বসে স্যুটেড-বুটেড দুই পুরুষ। যাদের একজন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক, অপরজন বিশেষ অতিথি। আর সামনে স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক মহিলা, যার শরীরে কোথাও এক টুকরো সুতোও নেই। গদি আঁটা নরম চেয়ারে বসে গম্ভীর মুখে ওই নগ্ন নারীদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে চলেছেন পুরুষদ্বয়। পায়ের

নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উঠে আসছে তাদের আলোচনায়। এর পুরোটাই হচ্ছে লাইভ টিভি ক্যামেরার সামনে!

আর সেই মেয়েটি? যার শরীর নিয়ে হাজার চোখের সামনে এত আলোচনা? পুরো সময়টায় কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে নিজের শরীর প্রদর্শন করা ছাড়া তার কোনো ভূমিকাই নেই। গোটা আলোচনাপর্বে সে একবারও অংশ নিতে পারবে না। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য উদ্যোক্তাদের তরফে ২৫০ ইউরো পাবে সে। নগ্নতার মূল্য...

আজ গোটাবিশ্ব যেন মেনে নিচ্ছে ‘শরীর আমার অধিকার আমার’ স্লোগানের শারীরিক অধিকার তত্ত্ব। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্বেচ্ছায় জনসমক্ষে নগ্ন হতে পারে- অন্তত মনুষ্যত্বের কোনো সংজ্ঞায় তা মেনে নেওয়া যায় না। নারীসত্তার কী অবমাননা! যেখানে তার শরীরের প্রতিটি খাঁজের খুঁটিনাটি উঠে আসছে দুই পুরুষের সবিস্তার বর্ণনায়, বহু লোলুপ চোখের দৃষ্টিতে, সেখানে তার কোনো বক্তব্য থাকবে না কেন? কেন এই আলোচনায় সে একবারও অংশ নিতে পারবে না? দোকানে সাজানো শো পিসের মতো সেও নির্বাক, অনুভূতিহীন। নেহাতই জাজমেন্ট প্যানেলের সামনে উপস্থিত একটা ‘সাবজেক্ট’। ক্ষুধার্ত লক্ষ ব্যঘ্র-সিংহের আফ্রিকার জঙ্গলে যেন এক অসহায় হরিণশাবক!

‘সাবজেক্ট’।... তার প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই, চিন্তাশক্তি নেই, কথন ক্ষমতা নেই। আছে শুধু একটা শরীর। যে শরীর রিয়্যালিটি শোর লাগামছাড়া বাস্তবতার বিকিকিনির বাজারে মোটা দামে বিকোয়। টিভি চ্যানেলের ঝুলিতে আসে মোটা টিআরপি, প্রচুর বিজ্ঞাপন। খবরেই পড়লাম, এই শো ঘিরে ডেনমার্কে বেশ কয়েকটি নারীবাদী সংগঠন আপত্তি তুললেও জনপ্রিয়তার নিরিখে প্রথম দিকেই রয়েছে ‘নেকেড লেডি’।

এমন একটি শো-তে চটজলদি জনপ্রিয়তা যে আসবেই, সে তো খুবই স্বাভাবিক। তবু ভাবতে অবাক লাগে, পৃথিবীর কোনো এক উন্নত, আলোকজ্জ্বল কোণে এমন একটি অনুষ্ঠান লাইভ টিভিতে সম্প্রচারিত হচ্ছে। সেখানে আসছেন মহিলারা এবং তারা প্রায় প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত। এই শোর একটি এপিসোডে উপস্থিত হওয়া এক মধ্যবয়স্ক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা জানিয়েছেন, শোটি সম্প্রচারিত হওয়ার পর তাঁর কাছে পাঁচ-পাঁচটা বিয়ের সম্বন্ধ আসে!

আমাদের তো অশিক্ষা আর দারিদ্রের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকা জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ বিশাল এক দেশ। সেখানে শুধু বেঁচে থাকার লড়াইতেই জীবন কেটে যায় অধিকাংশ মহিলার। নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতা বা নারীত্বের উদযাপন আজও আমাদের দেশের বেশিরভাগ অংশেই অর্থহীন হেঁয়ালি। কিন্তু প্রাচুর্যের সম্ভারে ঝলমলে ডেনমার্কে তো তা নয়। তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে ফেলার পুরস্কার হিসেবে কতগুলো বিয়ের প্রস্তাব এল, সেটাই এমন মূখ্য

হিসেবে উঠে এল কেন? ফেমিনিস্টরা ছিছি করায় উদ্যোক্তাদের তরফে বলা হয়েছে, মহিলারা তো এখানে স্বেচ্ছায় আসছেন, কাউকে জোর করা হয়নি। তাও ঠিক। কিন্তু কেন আসছেন, সেটাই প্রশ্ন। অনেকে বলতে পারেন, আমাদের দেশে শরীর নিয়ে যেমন ছুঁত্মার্গ আছে, ওদেশে তেমন নেই। ওরা শরীর নিয়ে কোনো কুণ্ঠায় ভোগে না। কিন্তু নারী শরীর সেখানেও নিছকই একটি ভোগ্যপণ্য। নাহলে তো এমন অনুষ্ঠান ঘিরে এত জনপ্রিয়তা ও বিতর্কের ঢেউ আছড়ে পড়ত না। এখানে উপস্থিত হয়ে গর্বিত কোনো নারী হাসিমুখে নিশ্চয় তার কাছে আসা বিয়ের প্রস্তাবের হিসেব দিত না। দেশ বদলাক, যুগ বদলাক, বদলে যাক শিক্ষার ধরন বা সংস্কৃতির আলো, কোনো কিছুতেই বদল নেই নারী শরীরের পণ্য-সর্বস্বতা।

চিন্তা করা যায় আধুনিক বর্বরতার কথা? ভাবুন তো পাঠক, হলভর্তি দর্শকের সামনে একজন নারীর পুরোপুরি নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য কতটা মর্মান্তিক ও পৈশাচিক হতে পারে? স্পট লাইটের বিম সম্পূর্ণ ঝুলে আছে ওই নগ্ন নারীদেহের ওপর। মূর্তির মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে মেয়েটি। আরো ভয়াবহ ব্যাপার দেখুন তো, ওই বিবস্ত্র নারীটির পাশেই সামান্য আলোতে মুখোমুখি বসে দুজন পুরুষ হোস্ট। তারা আলাপের ছলে একের পর এক মন্তব্য করতে থাকেন চোখের সামনে থাকা নারীদেহের প্রলেপ, খাঁজ এবং শৈল্পিক ঢেউ নিয়ে। সেই বর্ণনা শুনে হলভর্তি দর্শক হাত তালি দিয়ে অভিনন্দন জানান সেই নগ্ন নারীকে। আর এই পুরো দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী করে সেটা টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে! কেউ মন্তব্য করছে, 'আহ,

মেয়েটি তার শরীরের খাঁজগুলোতে মনে হয় একটু মোমের পরশ বুলিয়েছে। এত মসৃণ যে ওর শরীর থেকে আলো পিছলে পড়ছে,' জবাবে আরেক হোস্ট বললেন, 'ওহ, তাই তো। খেয়াল করে দেখ, মেয়েরা সবসময় শুধু নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই করে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শক জানতে পারছে একজন পুরুষ তার সামনের নারীকে নিয়ে কি ভাবছে। তাই না?'

'আরে ধুর, এটা স্রেফ আমার ভাষায় রাবিশ টাইপ সেক্সি!' : আলো আঁধারের খেলায় এভাবেই চলতে থাকে আলাপচারিতা। নগ্নতার ফেরি করা এই অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে চলছে উত্তেজনা আর তুমুল বিতর্ক। এই অনুষ্ঠানকে ডেনমার্কে বলা হচ্ছে স্রেফ একটি রিয়েলিটি শো। নির্মাতারা দাবি করছেন, 'এটি একটি কাব্য, নগ্নতা নয়।' উদ্যোক্তারা এই শোকে শিল্পকলা হিসেবে দেখাতে চাইলেও, নারী শরীর যে আজও পুরুষের কাছে নেহাতই পণ্য ছাড়া কিছু নয় তাই চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন অনেকে। শো'র জন্য মেয়েটিকে আড়াই শো ইউরো দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি শো'তেই মেয়েটির 'পারিশ্রমিক'-এর টাকা দর্শকদের সামনে নগ্ন অবস্থায় মঞ্চের ওপরই দিয়ে দেওয়া হয়। বিতর্কের একটি অংশে যারা আছেন, তাদের দাবি হলো শরীরের অধিকার তত্ত্ব মেনে নিলে, জনসমক্ষে একটি মেয়ে স্বেচ্ছায় নগ্ন হতেই পারে। কিন্তু তার শরীর নিয়ে প্রকাশ্যে টিভি ক্যামেরার সামনে দু'জন পুরুষ খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে, কিন্তু তার কোন বক্তব্য নেই। এ

ক্ষেত্রে তাকে জড়বস্তু ছাড়া আর কিছুই ভাবা হচ্ছে না বলে অভিযোগ অন্যপক্ষের।

এ ধরনের একটি শো কীভাবে সরকারী ছাড়পত্র পেলো, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নারীকে এভাবে উপস্থাপনের জন্য বিশ্ব গণমাধ্যমে এখন বিতর্কের ঝড়। নারী অধিকার নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের অভিযোগ, এভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে নারীর সম্মানহানি করা হচ্ছে। তবে দেশটির মানবাধিকার কর্মীরা এ ধরনের রিয়েলিটি শো বন্ধের দাবি তুলেছেন। তারা দাবি করেন, মানবদেহকে ‘জড়বস্তুর’ মতো উপস্থাপন করা একটি গুরুতর মানবতাবিরোধী অপরাধ।

এই রিয়্যালিটি শো শুধু ডেনমার্কের নারীদের নারীসত্তাই বিপন্ন করেনি, বিপন্ন করেছে সারাবিশ্বের নারীসত্তার এবং করা হয়েছে নারীত্বের চরম অবমাননা। আজ আকাশ-সংস্কৃতির যে বিপুল সক্ষমতা তাতে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সারাবিশ্বের কোটি কোটি টিভি দর্শক দর্শন ও ‘ধর্ষণ’ করে থাকে ওই রিয়্যালিটি শোর আগুনে কামুকতা। টিভিতে উপস্থিত পূর্ণ বিবসনা নারীর একচিলতে সুতামুক্ত নগ্নদেহ সারাবিশ্বের অসংখ্য মানুষের চোখ ‘শীতল’ করার পর উপস্থাপক ও সঞ্চালকের নখ থেকে মাথার চান্দি পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গের বিবরণ শ্রোতাদের কর্ণকে করে মধুময়...

রিয়্যালিটি শো নয়; যেন গরুর হাট! যেখানে প্রতিটি গরুর সঙ্গে থাকে বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী দালাল! প্রতিটি ক্রেতার সামনে সে

নিমিষেই হাজির। এরপর চলে গরুর গুণকীর্তণ বর্ণনা। গরুর নিতম্ব উঁচু, ফোলা, গোস্ত হবে অনেক...

নারীর এই অধঃপতনে পুরুষদের চরিত্র ও মানসিকতায় যে পরিবর্তন হয়েছে সেই বিষয়টিও বিশেষ লক্ষণীয়। এই জঘন্য নগ্ন শোতে অংশগ্রহণ করা এক নারীর কাছে হু হু করে বিয়ের প্রস্তাব আসাটা সে কথারই প্রমাণ। নৈতিকতা বিবর্জিত এই বিশ্বে নারীর শেষ অবলম্বন বুঝি নগ্নতা, বেহায়াপনা আর বেলেল্লাপনা! নগ্নতাকে কেন্দ্র করেই নারীর অর্থোপার্জন, বিয়েশাদীর আয়োজন এবং জীবন-সংসার?

শুধু তাই নয়; নগ্নতাকে আজ বেসাতী করে সমাজসেবা হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এক পত্রিকায় সংবাদ বেরুলো ‘পোশাক খুলে সমাজসেবা’। খোলামেলা দৃশ্যে অভিনয়ের পেছনের মূল কারণটা জানালেন পুনম পান্ডে। তিনি জানান, খোলামেলা দৃশ্যে অভিনয়ে রাজি হয়েছেন সমাজসেবার জন্য। এর মাধ্যমে তিনি সমাজসেবা করছেন! তিনি বলেন, ‘আমি বিবসনা হয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করেছি। কারণ জনগণ আমাকে এভাবে দেখে আনন্দিত হয়েছে। বিপুল সাড়াও মিলেছে!’ তার দাবি, মানুষকে আনন্দ দেওয়াটাই সমাজসেবা। সমাজসেবা না সমাজের ‘জ্বালা’?

হায় মানবতা! হায় পশুত্ব! প্রগতির নামে এভাবেই কি মানবতা আর পশুত্বে গলাগলি হয়! এসব তো আসলে পশুত্বের স্তরকেও অতিক্রম করে। মানুষ আর সব কিছুর স্রষ্টার বাণীতেই পড়ুন :

﴿ وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ ١٧٩ ﴾ [الاعراف: ١٧٩]

‘আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।’ {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত : ১৭৯}

ধর্ষণচিতায় দগ্ধ নারী : আগুন নেভাতে গেলে পুড়ছে হাত

ভোটে, নিজস্বার্থে, দলীয় হীনকামনায় এবং আদর্শের ধ্বজা উঁচু করতে নারীর ব্যবহারের জুড়ি নেই। নারীকে আজ বহুতলবিশিষ্ট ভবনের নিচতলার গেটের চাবির মতো সর্বজন ব্যবহার্য বস্তু বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই যে যেভাবে পারছে, যখন পারছে নারীকে হীনস্বার্থে ব্যবহার করছে। এর ভয়ানক একটা নজির দেখলাম আমরা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময়। এর আগে চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইসলামবিদ্বেষীতার কারণে আওয়ামী সরকার চরম মার খায় এবং সবকটিতে গোহারা হেরে যায়। এই পরাজয়ের একমাত্র ও প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় হেফাজত দমন ও শাপলা চত্বরের মধ্যরাতের গণহত্যাকে। ইসলামের পক্ষের লোকেরা নয়; স্বয়ং ইসরামবিদ্বেষী ও বামপাড়ার মিডিয়ার লোকেরাই তা স্বীকার ও লেখা-সম্পাদকীয়তে প্রকাশ করতে থাকে।

এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের রেশ না কাটতেই হাজির হয় গাজীপুর সিটি নির্বাচন। সরকারের দুর্ভাগ্য, তারা আগের চার সিটি নির্বাচনের আগেই গাজীপুরের তফসিল ঘোষণা করে ফেলে এবং গাজীপুর থেকে বের হয়ে আসাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সব রাগ গিয়ে পতিত হয় হেফাজত ও হেফাজত নেতা আল্লামা শফীর ওপর। দায় সব তাঁরই! তিনিই জনগণকে সত্যের দিকে আহ্বান করে বাতিলের মসনদকে টলিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাকেই ঘায়েল করতে হবে, হেনস্থা করতে হবে! কিন্তু উপায়? উপায়ও পেয়ে যায় ষড়যন্ত্রকারীরা। সেই উপায় বের করতেই টেনে আনা হয় নারী ইস্যু। তাই তো

বলছিলাম, আজকের নারী যেন সর্বজন ব্যবহার্য কলাপসিবল গেটের চাবির মতো। যে কোনো নন্দিত ও নিন্দিত পথে তাদেরকে টেনে আনতেই হবে। এই টানাটানি করতে গিয়ে বিজাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ভর্তুকিখোর মিডিয়া টেনে আনল আল্লামা আহমাদ শফীর একটি ভিডিও-বক্তৃতা। এই ভিডিও-বক্তৃতাটি আসলে তারই কিনা তাতেই ঘোরতর সন্দেহ থেকে গেছে।

আল্লামা আহমদ শফীর বক্তব্য বা ওয়াজগুলো সাধারণত আল-আরব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ইয়ার আহমদ রেকর্ড করে থাকেন এবং আলোচিত ভিডিও-ওয়াজটিও আল-আরব এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক রেকর্ডকৃত ও বাজারজাতকৃত। আল আরব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ইয়ার আহমদ ওই ওয়াজ ও বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, 'শফী সাহেব হুজুরের এই ওয়াজটি আমি দুই-তিন বছর আগে চট্টগ্রামের কোথাও রেকর্ড করেছিলাম। কোথায় করেছিলাম, সেটি এখন আর মনে নেই। কারণ প্রতিবছর হুজুর শত শত স্থানে ওয়াজ করেন। আমি চেষ্টা করি হুজুরের সব বক্তব্য রেকর্ড করতে। আমি হুজুরের প্রায় প্রতিটি ওয়াজেই উপস্থিত থাকি। কিন্তু বিগত দুই-এক বছরে যে এ বক্তব্য রেকর্ড করিনি, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। করলে আমার মনে থাকতো।'

'হুজুরের বক্তব্য নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে, এটা সুপরিকল্পিত একটি অপপ্রচার। হুজুর আমাদের চট্টগ্রামের সব মানুষের মুরব্বি, সবার অভিভাবকের মতো। তিনি সাধারণ মানুষকে ধর্ম সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে নানা সময় নানা আঙ্গিকে কথা বলেন। আমরাই

দেখেছি, তিনি ৬০-৭০ বছরের বৃদ্ধমানুষকে সবার সামনে বকাঝকা করেন। সমাজের অনেক বড় বড় ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত মানুষকেও তিনি এভাবে বকাঝকা করেন, আপনার বাড়িতে গানবাজনা চলে কেনো? আপনার ছেলে নাকি নেশা করে? আপনার ঘরে নাকি পর্দা নাই? এমন বিষয়ে তিনি সবসময়ই সবাইকে সতর্ক করেন, উপদেশ দেন। তারা হুজুরের সামনে তার কথার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা বরং মাথা নিচু করে বসে থাকেন, নিচুস্বরে হাসেন। এলাকার মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকেই তিনি এমনটা করেন। এলাকার মানুষও বিনা বাক্যব্যয়ে হুজুরের কথা মেনে নেন।'

'এই ওয়াজটি তিনি কোনো একটি গ্রাম্য মাহফিলে দিয়েছিলেন সম্ভবত। গ্রামের মানুষের জন্য হুজুর সাধারণত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় ওয়াজ করেন এবং এমন সব উপমা দিয়ে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যেগুলো দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারেন। আমার মনে হয়, তিনি যা বলেছেন তাতে নারীদের মোটেও অসম্মান করা হয়নি, বরং নারীদের সম্মানকে আরো বাড়ানো হয়েছে। এতোদিন আগের একটি ওয়াজকে এখন মানুষের সামনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে ফায়দা ওঠানো নাস্তিকদের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়।'

ইয়ার আহমদের বক্তব্যের রেশ ধরে আমরা কয়েকটি বিষয়কে আলোচনার টেবিলে টেনে আনতে পারি। প্রথম কথা হচ্ছে; আল আরব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ইয়ার আহমদের বক্তব্য অনুযায়ী বক্তব্যটি কম হলেও দুইবছর আগের কোনো এক ওয়াজ

মাহফিলের। দুই বছর আগের একটি বক্তব্যকে কেনো আমাদের চতুর মিডিয়া হঠাৎ করেই সামনে নিয়ে এলো?

দ্বিতীয় কথা হলো, বিশেষ অপপ্রচারের জন্য আমাদের মিডিয়া যখন এই ইস্যুটি সামনে নিয়েই এলো, কেনো তারা এটিকে আল্লামা আহমদ শফীর সাম্প্রতিক বক্তব্য বলে চালিয়ে দিলো? দুই বছর সময়কে কি কেউ সাম্প্রতিক বলে? কোনো কোনো সংবাদমাধ্যমে এই বক্তব্যকে ‘কয়েকদিন’ আগের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যম বক্তব্যটিকে ৮ জুলাই হাটহাজারীতে দেওয়া আল্লামা শফীর বক্তব্য বলে প্রচার করেছে। অথচ আল্লামা শফী জুলাইয়ের প্রথম থেকেই উমরার উদ্দেশে সৌদি আরব অবস্থান করেন। তবে কেনো মিডিয়ার এই নির্জলা মিথ্যাচার?

তৃতীয় কথা হলো, আল্লামা শফী বক্তব্য দিলেন অথচ তার সামনে উপস্থিত শ্রোতারা কেউ প্রতিবাদ করলো না। এক বছর গেলো, দুই বছর গেলো কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিবাদ হলো না; একজন নারীও সরব হলেন না তার ‘অপমানের’ প্রতিশোধ নিতে। অথচ দুই বছর পর তার সেই বক্তব্য নিয়ে হঠাৎ করেই আমাদের মিডিয়া সরব হয়ে উঠলো। কতিপয় নারীনেত্রী আর ধাপ্পাবাজ রাজনৈতিক নেতার শরীরে আগুন ধরে গেলো, জাত গেলো জাত গেলো বলে। অথচ সরাসরি যাদের সামনে বললেন তাদের গায়ে আগুন লাগলো না, তাদের মা-বোনের ইজ্জত গেলো না; ইজ্জত গেলো এসব নারীদরদীর! তাও তিন বছর পর! বাঙালি নারীর ইজ্জত কি এতোই সস্তা? তিনবছর পর তার ইজ্জত ঢাকার জন্য আমাদের

নারীনেত্রীদের টনক নড়লো! তবে কি বাঙালি নারীরা এতোদিন আব্রুহীন হয়ে পথেঘাটে পড়ে ছিলেন?

আল্লামা শাহ আহমদ শফী (দা.বা.) যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তার বক্তব্যের ফলে কোনো নারী কি ধর্ষণের শিকার হবেন? কোনো নারী কি স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হবেন? কোনো নারী কি যৌতুকের মতো অভিশাপের শিকার হবেন? কোনো নারী কি কর্মস্থলে তার সহকর্মীর হাতে যৌনাক্রান্ত হবেন? স্কুল-কলেজে কি এর দ্বারা ইভটিজিং বেড়ে যাবে? এর প্রত্যেকটার উত্তরই হবে 'না'। তাহলে তার বক্তব্যে যদি এতোসব উপকারিতা থেকে থাকে তবে কোন অমৃত সুধার তালাশে আমাদের তথাকথিত নারীনেত্রীরা ১৮ জনের মানববন্ধন নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়ায়? আর আমাদের বেহায়া মিডিয়াগুলো কীভাবে সেই ১৮জনের মানববন্ধনের ছবি প্রথম পাতায় ছাপতে পারে? ১৮জনের জনসমর্থনই কি দেশের ১৭ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে?

কী কারণে দোষ ধরা হয় আল্লামা আহমদ শফীর? তিনি নারীকে ঘরে সুরক্ষিত থাকতে বলেছেন। তাকে অনর্থক বাইরে বের হতে নিষেধ করেছেন। তাকে ভিন্নপুরুষের সঙ্গে চলতে নিষেধ করেছেন। চাকরিতে, স্কুল-কলেজে, ছেলেদের সঙ্গে উন্মুক্তভাবে মিশতে নিষেধ করেছেন। একজন মেয়ের জন্য এটা কি অপমানসূচক উপদেশ? তিনি মেয়ের বাবাকে বলেছেন মেয়ের খোঁজ নিতে, মেয়ে চাকরির নামে অন্য ছেলের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে কী-না, স্কুলের নামে পার্কে বসে আড্ডা দিচ্ছে কী-না, সে যা উপার্জন করছে সেগুলো হালাল

কী-না এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন। এগুলো একজন অভিভাবককে পরামর্শ দেয়াটা কি মানবতাবিরোধী কাজ? এ বরং কুরআনের সরাসরি নির্দেশ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ ﴾ [الاحزاب: ٣٣]

'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।' {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩৩}

এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে-

﴿إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ ﴾ [الاحزاب: ٣٢]

'যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়ার অধিকারী হও, তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যধি রয়েছে। তোমরা সংযত কথাবার্তা বলবে।' {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩২}

বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে ওয়াজ-মাহফিল একটি অতি সাধারণ বিষয়। সেসব ওয়াজে নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ছেলে-মেয়ের প্রতি আচরণ, পিতা-মাতার মর্যাদা বিষয়ে খুব সাধারণ ভাষায় বক্তব্য রাখেন ধর্মীয় বক্তারা। সেখানে শুধু তেঁতুল নয়, আগ্রহী শ্রোতাদের বুঝাতে মুরগি-ডিম, চোর-ডাকাত, স্বামী-স্ত্রী, ঢাকা-বাগদাদ

এমন নানা ধরনের উপমার অবতারণা করেন বক্তারা। এটা গ্রামীণ ওয়াজে খুবই প্রচলিত একটি বিষয়। এমনকি গ্রামের মাহফিলে সেই বক্তাকেই বেশি তোয়াজ করা হয়, যে যতো বেশি বিভিন্ন ধরনের উপমা ব্যবহার করতে পারেন। সেখানে তেঁতুল উপমা অতি সাধারণ একটি উপমা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং শহরের ওয়াজ না শোনা সুশীলব্যক্তিদের কানে যখন এইসব গ্রাম্য উপমা আর গ্রামীণ দরদমাখা কথাবার্তা পতিত হয় তখন তারা মনে করেন, এটা বুঝি গালি, অতি করুচিপূর্ণ বক্তব্য! আল্লামা শফীও সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন এবং অবমাননা রুখতে সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় বিষয়টি প্রতিহত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মাত্র। এখন শহরের আধুনিক মানুষরা যদি গ্রাম্য ভাষাকে গালি মনে করে আল্লামা শফীকে অপরাধী ঠাওরান, তাহলে দোষটা আসলে কার, সেটা বিবেচনার দাবি রাখে।

আবার আল্লামা শফীর বক্তব্য আমাদের মিডিয়ায় আংশিকভাবে বিবৃত হয়েছে। তিনি নারীদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার ব্যাপারে বলার আগে বলেছেন, নারীরা ঘরের রাণী। আপানারা কেনো বাইরে যাবেন? আপনার বাবা, স্বামী, ছেলেকে বলুন আপনার কী দরকার। তারা আপনাকে এনে দেবে। আপনি শুধু ঘরে বসে আরাম-আয়েশ করবেন।

সুতরাং আল্লামা আহমদ শফী দোষটা করলেন কোথায়? আমাদের সমাজব্যবস্থাটা তো তার বক্তব্যের চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন নয়। কিছুদিন

আগে আইসিডিডিআরবি একটি জরিপ করেছে, যাতে বলা হয়েছে, দেশে ১৮ বছরের আগেই অন্তত ৫০ ভাগ শহুরে তরুণ-তরুণী যৌন অভিজ্ঞতা নিচ্ছে। এরা পরোক্ষভাবে প্ররোচিত হয়ে এমনটা করছে। এদের এক-তৃতীয়াংশ আবার গ্রুপ সেক্সে (দলগত যৌনকর্ম) জড়িয়ে পড়ছে। (নাউযুবিল্লাহ)

আইসিডিডিআরবি তাদের প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেছে, ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী তরুণেরা যৌনকর্মে লিপ্ত হচ্ছে পর্নোগ্রাফি দেখে।

গত বছর ‘সময় টিভি’ থেকে করা এক জরিপে উঠে এসেছে আরও ভয়াবহ তথ্য। এই টিভির পক্ষ থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা রাজধানী ঢাকার বেশ কয়েকটি স্কুল ঘুরে জানতে পারেন, স্কুলের ৮২% ছাত্র-ছাত্রী সুযোগ পেলেই মোবাইলে পর্নোগ্রাফি দেখে। ঢাকা শহরের ৬২% স্কুলপড়ুয়া ক্লাসে বসেই পর্নোছবি দেখে। ৪৪% প্রেম করার জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আর স্কুলপড়ুয়া মেয়েরা মনে করে, তার একটা বয়ফ্রেন্ড থাকতেই হবে, না হলে সে স্মার্ট না। একাধিক বয়ফ্রেন্ড থাকাটাও একটা ক্রেডিটের ব্যাপার মনে করে তারা।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এটা কলেজ-ভার্সিটি বা সাধারণ নারীদের ওপর জরিপ নয়, এটা স্কুলের মেয়েদের ওপর করা জরিপ। যারা এখন এসএসসির নিচে অধ্যয়নরত এবং তাদের কারোরই বয়স ১৬-১৭-এর ওপরে নয়।

তো আমাদের সুশীল নারীনেত্রী আর দরদী সাজা পুরুষরা এই বাস্তবতায় নিজেদের অবস্থান কোথায় তুলবেন? সমাজ যেখানে চাক্ষুস পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে, মেয়েরা যখন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সর্বক্ষেত্রে যৌনতার মতো ভয়াবহ ব্যধিতে আক্রান্ত, সেখানে আল্লামা শফীর এই সহজকথন কেনো তাদের গায়ে কাঁটা দেয়? তিনি বিষয়গুলো সহজ আর সরল ভাষায় বলেছেন বলেই কি তিনি এতোটা প্রশ্নবাণের শিকার হয়েছেন? নাকি এসব কথা বলে মানুষকে সচেতন করলে অনেকেরই ভোগবাদী চরিত্র খসে পড়ার ভয় আছে?

একটা বাস্তব কথা প্রকাশ করা অপরাধ? নারীকে দেখলে পুরুষের কামভাব জাগবে, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? এটার মধ্যে রুচি-কুরুচিরই কী আছে? এটা আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের প্রতিটি পুরুষের বেলায়ই প্রযোজ্য। বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাষায় বলেছেন, ‘কামভাব নারী-পুরুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (ন্যাচারাল টেনডেন্সি) এবং এর অনুপস্থিতি ঘটলে কোনো নারী কিংবা পুরুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না।’ (Three contributions to the theory of sex)

নারীদের ব্যাপারেও ফ্রয়েড অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন,

The great question that has never been answered, and which I have not yet been able to answer, despite my thirty years of research into the feminine soul, is 'What

does a woman want? (From Sigmund Freud: Life and Work by Ernest Jones, 1953)

'যে জটিল ও বড় প্রশ্নটির জবাব মেলেনি এবং ৩০ বছর ধরে এখন পর্যন্ত আমি যে প্রশ্নটির জবাব দিতে সক্ষম হইনি, তা হচ্ছে, একজন নারীর বাসনা কী? নারীর মন কী কামনা করে?' (আর্নেস্ট জোনস, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের জীবন ও কর্ম, ১৯৫৩)

সিগমুন্ড ফ্রয়েডকে বলা হয় আধুনিক মনোবীক্ষণের জনক। তিনিই নারী-পুরুষের যৌনতার ব্যাপারে এভাবে খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন এবং মোটাদাগে বলে দিয়েছেন, নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ থাকবেই- এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। সেটা স্কুল হোক, কলেজ হোক, চাকরি কিংবা পথেঘাটে হোক; নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ অনস্বীকার্য। সে হিসেবে আল্লামা আহমদ শফী কুরআন-হাদীসের আদেশ-নিষেধকে উপমার ভঙ্গিমায় বলেছেন। তার উপমা এবং সোজা-সাপ্টা কথায় যদি কারো আঁতে ঘা লাগে তাহলে সেটা যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। সেটা নিয়ে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রাজনীতিবিদরা বড় চতুর ও বুদ্ধিমান! অপব্যাখ্যা করে নিজেদের পক্ষে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। পর্দা রক্ষার্থে নারীর অনাবশ্যক বাইরে না যাওয়ার গুরুত্বের জবাবে তাদের বক্তব্য, 'নবীজির স্ত্রী ব্যবসা করতেন। তিনি তার স্ত্রীকে ব্যবসা করতে বারণ করেননি। তাছাড়া নবীজি জ্ঞান অর্জনের জন্য

প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশেও যেতে বলেছেন। সেখানে তিনি নারী বা পুরুষ আলাদা করে বলেননি।’

এদের কে বুঝাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা যখন ব্যবসা করতেন তখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নবীই হননি। তিনি নবী হওয়ার পর যখন মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ইসলাম গ্রহণ করেন, তৎপরবর্তী সময়ে তিনি ইসলামের কোন আদেশ-নিষেধটা অমান্য করেছেন, তাছাড়া তারা চীন দেশে জ্ঞানার্জনে যাওয়ার যে বাণীটা প্রায়ই আওড়ান সেটা আদতে কোনো হাদীসই নয়, এটা জাল হাদীস বা সাধারণ আরবী প্রবাদ। বাক্যটির আরবীরূপ হচ্ছে,

«اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ»

হাদীসবিশারদগণ এটাকে বানোয়াট হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, বিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন, حديث باطل لا أصل له

‘এটি একটি ভিত্তিহীন জাল হাদীস।’

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

اطلبوا العلم ولو بالصين. موضوع

‘ইলম শেখার জন্য চীন পর্যন্ত হলেও যাও, হাদীসটি জাল।’

আল্লামা মারঈ হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ليس هذا من كلام النبي

‘এটা রাসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়।’

এভাবে অসংখ্য হাদীসবিশারদ এটাকে বানোয়াট ও জাল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু রাজনীতিবিদদের যে দরকার যেনতেন আকারের একটা হাদীস, যদ্বারা ইসলামের শালীনতা ও পবিত্রতার পর্দা বিধানের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করতে পারেন। কিন্তু কার ঘাড়ে একাধিক ধড় যে, তাদের যা হাদীস নয় তা হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেওয়া কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে সতর্ক করবে!

যাহোক, আরও অবাক করার মতো বিষয় হলো, আলেম-উলামার ব্যাপারে মুখচেনা কতিপয় নট-নটী অভিযোগ করেছেন, তাঁরা নাকি ধর্মের অপব্যাখ্যা করছেন। কী আজব কথা! তাঁরা সারাদিন সারা বছর বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ইসলাম শিক্ষাদান করে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করেন, আর সুবিধাভোগী নারীনেত্রীরা দেশবাসীকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন! এর চেয়ে বড় কৌতুক আর কী হতে পারে!

দেশবাসী সবচেয়ে অবাক হয়েছে জনৈক নাট্যাভিনেত্রীর আস্ফালিত বক্তব্য শুনে। যাকে নাটক-সিনেমায় সাধারণত পতিতার চরিত্রে নির্বাচন করা হয়, কারণ তিনি এই রোলে সবচেয়ে বেশি মানানসই। তিনি ৭০ বছর হাদীস শিক্ষাদানকারী আলেমকে বললেন, আপনি তওবা করুন। লও ঠ্যালা! একজন পতিতা চরিত্রের অভিনেত্রী, যার

দুই স্বামী বিগত হয়েছেন, তিনি নব্বইঊর্ধ্ব দেশবরেণ্য এক আলেমকে বলছেন, আপনি তওবা করুন!

নারীদেরকে বিভিন্ন উপমায় ভূষিত করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দার্শনিক, লেখক, সাহিত্যিক ও ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তি। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

‘পুরুষ প্রভু, নারী দাসী।’ -এ্যারিস্টটল

‘পুরুষ হচ্ছে অনিবার্য, অপরিহার্য, অবধারিত; আর নারী হচ্ছে আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত।’ -মিশেল

‘নারী ভূমি, নারী উর্বর তবে ওই উর্বরতা সৃষ্টিশীল নয়, তাকে সৃষ্টশীল করে পুরুষ। -হিপক্রিটাস

‘রয়েছে এক শুভ নীতি যা সৃষ্টি করেছে শৃঙ্খলা, আলোক ও পুরুষ, রয়েছে এক অশুভ নীতি যা সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা, অন্ধকার ও নারী।’ -পিথাগোরাস

‘নারী এমন এক রাজ্য যাকে শুধু জয় করলেই হবে না, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত, পর্যদুস্ত আর পদদলিত করতে হবে, যেনো সে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।’ -নেপোলিয়ন

‘নারীর জন্মই হয়েছে পুরুষাধীন থাকার জন্য, তাকে চিরকাল তাই থাকতে দাও।’ -রুশো

‘পুরুষ প্রভু, নারী তার সেবিকা; গৃহে থাকা, সংসার করা, পুরুষের সেবা করাই নারীর প্রকৃত স্থান ও শক্তি।’ -রাসকিন

নারী ভালোবাসার জন্য, জানার জন্য নয়। -অস্কার ওয়াইল্ড

নারী একই সঙ্গে একটি আপেল ও সাপ। -হেনরিক হাইনে

কোলে থাকিলেও নারী, রেখো সাবধানে

শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নারী কভু নাহি চায় একা হতে কারো

এরা দেবী এরা লোভী

যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো

ইহাদের অতিলোভী মন

একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়

যাচে বহুজন। -কাজী নজরুল ইসলাম

আমরা জানি, এ্যারিস্টটল, পিথাগোরাস, রুশো, রবি ঠাকুর নারী সম্বন্ধে যা বলে গেছেন তা মিথ্যে। বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা দেখি, জার্মান বিজ্ঞজন হেনরিক হাইনে নারীকে সাপ বললে সেটি হয়ে যায় ‘বাণী চিরন্তন’, আর একজন আলেম যখন নারীর আকর্ষণকে তেঁতুলের সঙ্গে উপমা দেন তা হয়ে যায় অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী রাসকিন নারীকে পুরুষের সেবিকা বললে, তাকে গৃহকোণের আলোকবর্তিকা বললেও তিনি পূজনীয়, পক্ষান্তরে উলামায়ে কেরাম তাকে গৃহের রাণী বললে তিনি হয়ে যান

নারীবিদ্বেষী। কাজী নজরুল নারীকে অতিলোভী বলতে পারলেন, আর আলেম হয়ে গেলেন নারী অবমাননাকারী।

কথাসাহিত্যিক হাসানাত আবদুল হাই শাহবাগের কোনো এক নারীর দেহদানের ফিরিস্তি লিখলেই সেটি হয়ে যায় নারীর অবমাননা, কিন্তু সৈয়দ শামছুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন আজাদ, হেলাল হাফিজরা যখন নারীর বিভিন্ন অঙ্গসৌষ্ঠবের আকার, ধরন, বর্ণ, উপকারিতা নিয়ে সাহিত্যের তুবড়ি ছোটান তখন সেটি এই সমালোচকদের কাছে হয়ে যায় উপাসনার বিষয়।

যদি নিদেনপক্ষে বাংলা সাহিত্যের দিকেও দেখা হয় তবে সেখানে নারীকে নিয়ে নামী আর বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের এমনসব পঙক্তি আর লেখা পাওয়া যাবে যেগুলো সাধারণ ভদ্রসমাজে পাঠের উপযোগী নয়। তবুও যতোটুকু ভদ্র জিনিস উপস্থিত করা যায় ঠিক ততোখানিই আমাদের কুলীন সুশীল সমাজের সুরচিকর সাহিত্যপ্রতিভা তুলে ধরা হলো।

ব্যথাতুর প্রেমের কবি নির্মলেন্দু গুণ তার ‘স্ত্রী’ কবিতায় স্ত্রীকে ভালোবাসা শিখিয়েছেন এই ভাষায়-

‘রান্নাঘর থেকে টেনে এনে স্তনগুচ্ছে চুমু খাও/বাথরুমে ভেজানো দরোজা ঠেলে অনায়াসে ঢুকে যাও-/সে যেখানে নগ্ন দেহে স্নানার্থেই তৈরি হয়ে আছে।’

আল মাহমুদের ‘সোনালী কাবিনে’ তিনি উদারহস্তে ঢেলেছেন নারীর প্রতি তার ‘সুরুচি’র বাহাদুরি-

‘তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী/খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ/শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি/তারো বেশী ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ। (সনেট ১০ : সোনালি কাবিন)

কবি ও লেখক সৈয়দ শামছুল হক আল্লামা শফীর সমালোচনায় বিবৃতি দেওয়া সতেরজন বিশিষ্টজনের একজন। তার লেখাজোখা নিয়ে কথা বলতেও বিবাহিত হতে হয়। অবিবাহিতদের জন্য সাধারণত তার রচনা পড়া নিষিদ্ধ। তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের লেখক। দেখুন তার অ্যাডাল্ট কবিতা-

শত বাধা সত্ত্বেও থামতে পারে না কামুক পুরুষ/দুজনের দেহ ছিঁড়ে বের হয় দুধ-পূর্ণিমা/আর তা নেমে আসে স্তনের চূঁড়ায়/বাড়তে থাকে কামনার জ্বর/আর জ্বরতপ্ত হাত কুড়ায় কামনার ফুল। (‘ভালোবাসার রাতে-২৯’)

হুমায়ুন আজাদের কবিতা এখানে উল্লেখ করা গেলো না অতিরিক্ত ‘রুচিবোধের (?) কারণে। তবে তার একটি বচন অমৃত পড়তে পারেন পাঠককুল- ‘চোখের সামনে আমার মেয়ে বড় হচ্ছে। কিন্তু সামাজিক নিয়মের বেড়াজালে আমার হাত-পা বাঁধা।’

পাঠকগণ যদি বাংলা সাম্রাজ্যের সবচেয়ে নিকৃষ্ট অশ্লীল চটি বই পড়তে চান তবে ‘হুমায়ন আজাদ ও ১০০০ ধর্ষণ’ নামের বইটা পড়তে পারেন। তবে সাবধান, বইটা পড়ার পর অন্তত কয়েক লাখবার তাওবা-ইস্তেগফার পাঠ করতে ভুলবেন না যেন!

এই হলো আমাদের সুশীল আর সভ্য সমাজের রুচিভেদ। উলামায়ে কেরাম গ্রামের সহজ সরল ভাষায় বললেই সেটা হয়ে যায় কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আর সমাজের ভোগবাদী পুরুষরা বললে সেটা হয়ে যায় রমণীবান্ধব শ্লোকমালা!

এ কারণেই সাংবাদিক ফারুক ওয়াসিফ লিখেছিলেন, বার্বি ডল আর সেক্সি গ্রেনেডের যুগে পারবে না হেফাজত...

কারণ ইসলামপন্থীরা জানে না, কী করে নকল স্ক্যান্ডাল (কেলেঙ্কারী) তৈরি করতে হয়। তাদের কাছে কোনো ব্যক্তির দোষ ধরা কুরআনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। হাদীস বলে, অন্যের দোষ তুমি গোপন রাখো, আল্লাহ তোমার দোষ গোপন রাখবেন। এই নির্দেশের পর কীভাবে তারা প্রতিপক্ষের দোষ খুঁজতে যাবে? এই জন্যই হয়তো ফারুক ওয়াসিফরা আক্ষেপ করে বলতে পারেন, সেক্সি গ্রেনেড আর বার্বি ডলের যুগে আপনাদের (হেফাজতের) বেইল নাই...

[লেখার কিছু অংশ সাপ্তাহিক লিখনী ১৬ জুলাই ২০১৩ এর সৌজন্যে]

আল্লামা আহমদ শফীর ভিডিও বক্তৃতার তেঁতুল তত্ত্ব ছাড়াও আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে ইসলামবিদ্বেষীরা অভিযোগ উত্থাপন করে। যেমন, গার্মেন্টে চাকরির বিষয়ে তিনি বিশেষ উপদেশ প্রদান করেছেন। মেয়েদেরকে ক্লাস ফোরের বেশি না পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বস্তুত একথার ব্যাখ্যা হচ্ছে; আল্লামা শফীর দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলি, ১০-১২ বছরেই মেয়েরা বালেগ হয়ে যায়, ক্লাস

সিক্স-সেভেনেই। আর বালেগ হলে ইসলাম ধর্মের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের জন্য পর্দাহীন অবস্থায় পরপুরুষের সামনে যাওয়া নিষেধ। এটা কুরআন-হাদীসের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ। যেহেতু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্দা মানা হয় না এবং কখনো কখনো পর্দা মানার কারণে অপদস্থ হতে হয়, তাই তিনি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েদের বেপর্দা পরিবেশে উচ্চশিক্ষাকে অনুৎসাহিত করেছেন। গার্মেন্টসে চাকরির বিষয়টিও এমন।

বস্তুত তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর ওপর নানাবিধ নির্যাতন এবং অনাচার দেখে গভীর ভাবনা ও নারী সমাজের প্রতি অতুলনীয় সহানুভূতি থেকে এই পরিবেশে শিক্ষা এবং চাকরি ব্যবস্থাকে নারীর জন্য ভয়াল মনে করেছেন। ইসলামে নারীশিক্ষা এবং শরঈ বিধান ও পর্দা মেনে চাকরি করে অর্থোপার্জনকে নাজায়েয বলেননি।

ওয়াজমাহফিল, ইসলামী বক্তৃতা, সভা-সমাবেশ এবং সাহিত্যপাঠ এসবের প্রত্যেকটিই জীবনাদর্শের অনুসরণের পথ তৈরি করে। এটা মেনে চলতে হয়। একজন বক্তার যেমন হাজার ভক্তশ্রোতা থাকে তেমনিভাবে একজন লেখকেরও হাজার ভক্তপাঠক থাকে। সুতরাং একজন লেখকের কলমে নিন্দনীয় অশ্লীলতা থাকার পরও হয়ত তিনি পান বাংলা একাডেমি, একুশে পদকসহ হাজার রকমের পদক-পুরস্কার। পক্ষান্তরে একজন দরদী সমাজসেবক যখন নারীকে বোধগম্য সরলভাষায় বাস্তবনির্ভরতার ভিত্তিতে তেঁতুলের সঙ্গে তুলনা করেন তখন তিনি হন নিন্দার পাত্র! একেই বলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া। মানুষের মধ্যে যখন বিবেচনা ও বিচারশক্তি লোপ পায় তখন

সে ক্ষমতা, শাসন কিংবা অর্থবিত্তের চূড়ায় বাস করতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের সংজ্ঞা তখন তার জন্য প্রযোজ্য হয় কিনা সেটা নতুন করে ভাবা উচিত। আমার মনে হয়, যারা ইসলামের পর্দা বিধানকে একারণে গালমন্দ করেন তারা নিজেদের পরিচয়ের মর্যাদা ভুলে গেছেন কিংবা ভুলে আছেন। অন্তত বিবেকবান মানুষ থেকে এধরনের আচরণ আশা করা যায় না। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, উলামায়ে কেরাম সমালোচিত হয়েছেন মনুষ্যত্বের সংজ্ঞাহারা এধরনের কিছু ভ্রান্ত লোকের হাতে।

সমালোচকরা সজ্ঞানেই তেঁতুল তত্ত্ব নিয়ে সমালোচনা করেছে। তারা আল্লামা শফীর বক্তব্যকে ইসলামের বাণীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মানুষদেরকে খেপানোর কসরত করেছে। অথচ তিনি তেঁতুলতত্ত্ব নিয়ে যা বলেছেন সেটা ছিল নিজের তরফ থেকে উত্থাপিত একটা উপমা। এই উপমা তো আর ইসলাম দেয়নি। এটা তিনি শ্রোতাদেরকে বুঝানোর জন্য সহজ উপমায় বলেছেন। সেই উপমা দিতে গিয়ে যদি তিনি কিছুটা গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেন তবে সেটাকে ইসলামের বাণী বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। বিষয়টি যেহেতু রুচিবোধ নিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উপমাপ্রিয় বিজ্ঞজনের নাম এসেছে। তারা রমণীর বিভিন্ন অঙ্গকে বিশেষ ফলের সঙ্গে তুলনা করলে সেটা দোষ হয় না, আল্লামা শফী স্পেসিফিক কোনো অঙ্গের কথা না বলে রমণীয় নারীকে তেঁতুলের সঙ্গে উপমা দিলে দোষটা খুব বেশি হওয়ার কথা না। তাদের উপমা নান্দনিক

ভাষায় আর তারটা খানিকটা গেঁয়ো ভাষায়, এই যা তফাত। তাও গেঁয়ো লোকদের বুঝানোর জন্য।

তাই যে কোনো বিবেকবান মানুষ একথা বলতে বাধ্য হবেন যে, তিনি যা বলেছেন তাতে নারীদের মোটেও অসম্মান করা হয়নি, বরং নারীদের সম্মানকে আরো বাড়ানো হয়েছে। এতোদিন আগের একটি ওয়াজকে এখন মানুষের সামনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে ফায়দা ওঠানো অবিশ্বাসীদের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়। এইসব অপপ্রচারে কোনো লাভ নেই। এই জাদু জাদুকরের বিরুদ্ধেই যাবে এবং গিয়েছেও তাই। দাজ্জালদের এই সামান্য অপপ্রচারে ঈমানদারদের ঈমানে চির ধরবে না।

নারীকে নানা উপমা দিয়ে কবি, লেখক, নেতা, দার্শনিকরা বিকৃত আনন্দ লাভ করতে পারেন। কিন্তু একজন ইসলামী ভাষ্যকারের ভাবনায় থাকে কেবলই মানবিক চিন্তা। সুতরাং কবিদের নির্জলা অশ্লীলতায় দেশজুড়ে সমালোচনা না হলে একজন ইসলামী ভাষ্যকারের সাধারণ উপমায় তা হবে কেন?

কেউ প্রশ্ন করেছেন, উনি কি মায়ের পেটে জন্ম নেননি? তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইসলামবিদ্বেষীরা বলে, মা বোনের কথা চিন্তা করেও তো আল্লামা শফীর একথা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল? তখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, নারী বলতেই আমরা কেনো যে শুধু মা আর বোনকে টেনে আনি? আহা! এই বোধটা যদি সবার মাঝে থাকতো, তাহলে আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশে

এক পিস পর্নো ভিডিও দেখা হতো না কোনো ডিভাইসে। অথচ বাংলাদেশে শুধু পর্নো ব্যবসার বাজার ৮ শো কোটি টাকার!

যখন পর্নো ভিডিওতে বিমুগ্ধ হয় এসব অশ্লীল চরিত্রের লোকেরা, তখন কি এরা একবারও ভাবে নিজেদের মা-বোনের কথা? উপদেশ দিলে মা-বোনের জাত যায় কিন্তু নোংরামির সময় মা- বোনের কথা মনে থাকে না? এরা রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় যখন প্রতিটি মেয়ের দিকে তাকায়, যারা টাইট জিন্স আর টিশার্ট পরে যাচ্ছে, তাদের কি এরা মা-বোন বলে ডাক দেয়?

এই ঘটনায় সবচেয়ে অবাক করা যে কাণ্ড ঘটেছে তা হলো, ইসলামবিদ্বেষীরাই ইসলামের বড় স্কলার সেজে নানা রকমের উপদেশ-আদেশ প্রদান করেছে! কত ফতোয়া আর তাফছীর, হাদীস এদের মুখে চালু হয়ে গেছে!

ক্ষমতার জন্য নারী না নারীর জন্য ক্ষমতা?

উলামায়ে কেরামের নারী বিষয়ক ভাবনা ও ধ্যান-ধারণাকে ইসলামবিদ্বেষীরা সর্বদা অপব্যাখ্যা করে থাকে। পক্ষান্তরে তারা নারীদের ক্ষমতায়নের নামে তাদের চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, উলামায়ে কেরাম নারীদের আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ক্ষমতা, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক, তা মনেপ্রাণে কামনা করেন এবং নানাভাবে সে কথাটাই প্রকাশ করে থাকেন। পক্ষান্তরে যারা নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেন, তারা প্রকৃতপক্ষে নারীর ক্ষমতা নয়, নিজেদের ক্ষমতায়নের জন্য তারা নারীদেরকে ব্যবহার

করে থাকেন। বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। একারণেই আল্লামা আহমদ শফী নারীদের বিষয়ে কোনো কথা বললে তা হয়ে যায় নারী বিদ্বেষ। আর ইসলামবিদ্বেষীরা নারীদের অপমানসূচক কিংবা ব্যাঙ্গাত্মক কথা বললেও তা হয়ে যায় নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন! যে কথাটা ওরা বললে বাহবা পায়, সেই কথাটা বললে উলামায়ে কেরাম হন নিন্দিত, নারীবিদ্বেষী! একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর বক্তব্যে নারীদেরকে সড়ক দুর্ঘটনার কারণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তার বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে :

'ডিজিটাল বিলবোর্ডের কারণে অনেক সময় চালকের দৃষ্টিভ্রম হয়। বিভিন্ন পণ্যের বিলবোর্ডে সুন্দরী নারীদের ছবি দেওয়া হচ্ছে। গাড়িচালকরাও তো মানুষ। রাস্তা দিয়ে চলার সময় চালকদের সেদিকে নজর যাচ্ছে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে।'

উপরের কথাগুলো ওই মন্ত্রীর একটি বক্তব্যের অংশ। এটি গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। সংবাদগুলোর শিরোনাম ছিল : 'সুন্দরী নারীদের বিলবোর্ড দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ'।

গত ২১ জুন '১৩ ইং সালের ঘটনা এটি। ওই দিনই বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় এবং তার পরের দিন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে মন্ত্রীর এ বক্তব্যটি ছাপা হয়েছে। ওই দিন থেকে মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। সুন্দরী নারীদের বিলবোর্ড নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্যের পক্ষে বিপক্ষে কোনো কথা দেখলাম না, কোনো গণমাধ্যমেই না। কাউকেই বলতে দেখলাম না, নারী বিজ্ঞাপনকর্মী কিংবা জটিল নাম

সর্বস্ব নারী সংগঠনগুলোরও কেউ না। একটু অবাকই হলাম; একটু স্বস্তিও পেলাম।

অবাক হলাম এ জন্য যে, এ দেশে এখন নারী সমাজের পক্ষ সেজে হুংকার দিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ার মতো নারী সংগঠন তো একটি দু'টি নয়। কোনো বিবৃতি দিলেও দেখা যায় সেখানে সংগঠনের সংখ্যা হাফ সেঞ্চুরি পার হয়ে গেছে। তা হলে মন্ত্রীর এমন বিতর্কিত বক্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না কেনো? 'সুন্দরী নারীদের ছবির দিকে চোখ যাওয়ার কারণে চালকরা দুর্ঘটনা ঘটায়।' এতবড় 'পশ্চাৎপদ, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও প্রগতিবিরোধী' বক্তব্য দিয়েও মন্ত্রী মহোদয় পুরোপুরি পার পেয়ে গেলেন! নারীবাদী সংগঠনের নেত্রীরা কি সব পিকনিকে চলে গিয়েছেন? আহা! আমাদের সর্বকর্মে পারদর্শী প্রগতিশীল মিডিয়া-বন্ধুরা তো ছিলেন। তারাও তো একটা হৈ চৈ লাগাতে পারতেন। না, তারাও এগিয়ে আসেন নি। নারীর এতবড় 'অবমাননা' তারা একদম নীরবেই সয়ে গেলেন। বিস্ময়েরই ব্যাপার! তবে স্বস্তি পেয়েছি এ জন্য যে, মন্ত্রীর বক্তব্যটা বাস্তব ছিল এবং সত্যও ছিল। নারী সম্পর্কিত সত্য একটা কথা এ সরকারের একজন মন্ত্রী বলেই ফেলেছেন। লোকলজ্জার ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হননি। দলের নারীবাদী সহকর্মীদের তোয়াক্কা করেননি। অন্যরাও তাকে ঘাটাতে যায়নি। তার মানে হচ্ছে, সমাজে নারীর উন্মুক্ত প্রদর্শনীর ক্ষতিকর দিকগুলো এখন মানুষ মেনে নিচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক একটি ব্যাপার। এ জন্য স্বস্তিবোধ করা যেতেই পারে।

কিন্তু স্বস্তির এ ঘোরটা কেটে গেলো কয়েকদিন পরেই। জুলাই মাসের শুরুতেই একটি ভিডিও ফুটেজ ছেড়ে দেওয়া হলো ইন্টারনেটে। সেখানে বাংলাদেশের প্রবীণ আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেব পরনারীর বিষয়ে প্রত্যেক পুরুষকে সংযত ও আত্মসংবরণে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন নারী তেঁতুলের মতো আকর্ষণীয়। নারীদের দেখলে পুরুষের মনের ভেতর প্রলুব্ধতা তৈরি হয়। তাই তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

ব্যস্ আর যায় কোথায়! ওই ফুটেজের বক্তব্য প্রমাণিত কি না যাচাই করা হলো না। ওটা কারো কারসাজি কিনা খোঁজ নেওয়া হলো না। প্রথমেই উগ্রপন্থী নারীবাদী নারীদের ২৭ কিংবা ৭২টি সংগঠন বিবৃতি দিয়ে বসলো। প্রভাবশালী টিভি চ্যানেল ও পত্রিকায় দিনের পর দিন অশ্রাব্য বিষোদগার চলতে থাকল। যেন এক ভয়ংকর নারীবিদ্বেষী হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। যেন দুনিয়ার সব নারীর দেহ ও সৌন্দর্যের সব মাধুর্য ও কমনীয়তা মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেছে। নারীরা যেন সব ইট, পাথর, বৃক্ষের মতোই আকর্ষণহীন উপাদানে পরিণত হয়েছে।

এক কাতারে নেমে এসেছে সব। উগ্র নারীবাদী সংগঠনের ঘরভাঙ্গা নারী নেত্রী, সিনেমা-টিভির নর্তকী-অভিনেত্রী আর ফরমালিনযুক্ত মিডিয়ার খেলোয়াড়রা সব একসঙ্গে হু হু বাতাস দিল। অপরদিকে বাম-রাম রাজনীতিক, অসৎ-মদ্যপ চরিত্রহীন সুশীলরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাঙ্গীরনগরে ধর্ষণের সেঞ্চুরি, ইডেন কলেজের নারী

কর্মীদের নিয়ে নেতাদের ভোগ-ফূর্তি আর দেশে-বিদেশে অহরহ নারী সহকর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কৃতিত্বে উজ্জ্বল ক্ষমতাধররা হঠাৎ 'তেঁতুল' নিয়ে যেন মাতোয়ারাই হয়ে গেল। যেন এক 'তেঁতুল' দিয়েই তারা তাদের নারী নিগৃহ, নারী নির্যাতনের সব দাস্তান মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চাইলো। চাইলো তেঁতুলের নামে নিজেদের সব হত্যা, লুট ও বর্বরতার কালোঅধ্যায় আড়াল করতে। কিন্তু তাতো হবার নয়। মন্ত্রীর সুন্দরী নারীদের বিলবোর্ডের কথায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, বাস্তবতা ঢেকে রাখা যায় না। তাই একযাত্রার দুইফলও মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। [সৌজন্যে : শরীফ মুহাম্মাদ, মাসিক আলকাউসার]

আজকের নারীবাদী সংগঠনগুলো যে নারী ধ্বংসের সংগঠনে পরিণত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভিকারুন্নিছা, ইডেন ও বদরুন্নেছার ঘটনায় তাদের মুখোশ খানিকটা উন্মোচিত হয়েছিল। ওই সময় মিডিয়া ঝড়ে এলোমেলো হয়েছিল তাদের ভালো মানুষির মুখোশ। কীভাবে নারীনেত্রীরা তাদের অধীনস্ত ও নবীন ছাত্রীদেরকে নেতাদের বাসায় পাঠাতো তাদের মনোরঞ্জনের জন্য, সে সংবাদ পাঠ করে বাংলাদেশের মানুষ আঁতকে উঠেছিল। সেই মুখোশধারী নারীনেত্রীরাই আজ নারীর ইজ্জত গেলো বলে দুই বছর আগের ওয়াজ মাহফিলের সাধারণ একটা উপমার বিষয়কে কেন্দ্র করে এদেশের বিখ্যাত আলেমের বিরুদ্ধে নোংরামি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে? কই ওদের তো সে সময় নারীর ইজ্জত হরণের তাজা সংবাদে মুখ খুলতে দেখা গেলো না! আসলে নারীর শত্রু আজ নারী।

নারীরা চিনতে পারছে না তাদের মূল শত্রুদেরকে। তাই শত্রুকে আপন ভেবে কাছে টেনে নিচ্ছে আর বন্ধুকে দুশমন ভেবে দিচ্ছে দূরে ঠেলে। ফলে বন্ধুবেশী শত্রুর গুপ্ত হামলা থেকেও রেহাই পাচ্ছে না, আবার প্রকৃত বন্ধু ও কল্যাণকামীদের দূরে ঠেলে রাখার কারণে বিপদের সময় তাদের সহযোগিতাও নিতে পারছে না। তাই নারীমুক্তির প্রথম ধাপ হচ্ছে শত্রু-মিত্র নির্ণয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া এবং শাহবাগীয় নারীমুক্তির স্লোগানধারীর ভয়ংকর ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।

ফাঁসির মঞ্চ সাজাতেও নারী!

ইতিহাসের সব ঘটন-অঘটনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারীর নাম। অনাবিল সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি সর্বত্র নারীর নাম! ইতিহাসে ফাঁসি দণ্ডের বিধান ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলার সুযোগ না থাকলেও বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তের ফাঁসির মঞ্চগুলোতে ঘটেছে নানা ভয়ঙ্কর ও বিচিত্র ঘটনা। কারণে, অকারণে ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করার মতো বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিশ্ব পরিমণ্ডলে। কোনো ফাঁসির মঞ্চ ছিল গৌরবদীপ্ত, ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। যেমন, রাসূল অবমাননায় ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে গাজী ইলমুদ্দিন শহীদ রহিমাহুল্লাহর শাহাদতবরণ। আবার কোনোটা খুবই কলঙ্কময়, সমালোচনার ঝড়ে বিধ্বস্ত।

স্বাধীনতার পর গত ৬৬ বছরে ভারতে বিভিন্ন অপরাধে দন্ডিত ৪৭৬ জনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ফাঁসি কার্যকর হওয়া ৪৭৬ জনের মধ্যে একজনও নারী নেই। অবশ্য হরিয়ানার প্রাক্তন বিধায়ক রেলু রাম পুনিয়ার মেয়ে সোনিয়ার ফাঁসি কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। সব প্রক্রিয়া শেষে যদি তার ফাঁসি কার্যকর হয় তবে সোনিয়াই হবে ভারতের প্রথম নারী যার মৃত্যুদণ্ড হবে ফাঁসিতে।

এর আগে অবশ্য দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী তামিল নারী নলিনীর ফাঁসি কার্যকরের কথা ছিল। সুপ্রিমকোর্ট এই নারীর ফাঁসির আদেশ বহাল রেখেছিল কিন্তু রাজীব

গান্ধীর সহধর্মিনী সোনিয়া গান্ধীর বিশেষ আবেদনের ফলে মৃত্যুদণ্ড থেকে নলিনীর সাজা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে নামিয়ে আনা হয়েছিল।

ভারতে কোনো নারীর ফাঁসি হবে কি না তা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল বিতর্ক চলছে। কেবল নারী হওয়ার কারণে অনেকেই তার প্রতি সহমর্মিতা থেকে তার ফাঁসির বিরোধিতা করছেন। ইতিহাসের গোড়া থেকেই নারীরা এভাবেই পেয়ে এসেছে সহমর্মিতা, অনুকম্পা ও অনুগ্রহ। ইসলাম নারীর প্রতি দেখিয়েছে সর্বোচ্চ সহমর্মিতা। রাসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে আলাদা করেছেন। নারীর প্রতি সেই শ্বাশ্বত সহমর্মিতার সূত্র ধরেই হয়ত ভারতের সোনিয়ার ফাঁসিদণ্ডের বিপক্ষে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে; সোনিয়া এমন কী অপরাধ করেছিলেন যে তাকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসির দড়িকে আলিঙ্গন করতে হচ্ছে? জানা যায়, ২০০১ সালে সম্পত্তির ভোগদখল নিয়ে সোনিয়া নিজ পরিবারেরই ৮ সদস্যকে নৃশংসভাবে নিজের হাতে খুন করেন। আইনজীবীরা বলছেন, সোনিয়াই হবে প্রথম ভারতীয় নারী যাকে স্বাধীন ভারতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য দেশগুলিতেও কোনো নারীকে ফাঁসি দেওয়ার কোনো ঘটনা নেই। পৃথিবীতে এ এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে যা নিয়ে ভারতের জনগণের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা রয়েছে। [তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়া ক্রনিকল থেকে অনূদিত, সূত্র : রাইজিন বিডি ২৪.কম]

এত বড় একজন পাষাণী, ঘাতকও কেবল নারী হওয়ার কারণে কোটি জনতার সহমর্মীতা পেয়েছেন, অনেকে তার ফাঁসির বিরোধীতা

করছেন। শুধু নারী হওয়ার কারণে নলিনী স্বয়ং সহধর্মিনীর আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বামী হত্যার দায় থেকে ফাঁসির রজ্জু হতে খালাস পান। কিন্তু যে নারীকে ফাঁসির রজ্জু থেকে বাঁচানোর এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, কখনও সেই নারীর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কারণে পুরুষকে যেতে হচ্ছে ফাঁসির মঞ্চে! এসব ঘটনার কোনোটাতে নারী সরাসরি জড়িত আর কোনোটাতে বা নির্যাতিত। বাংলাদেশে এপর্যন্ত আমার জানা মতে কোনো অপরাধের কারণে কোনো নারীকে ফাঁসির রজ্জু আলিঙ্গন করতে হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে যে কয়টা ফাঁসির ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে যে দুটি ঘটনা সবচেয়ে বেশি মর্মান্তিক ও চাঞ্চল্যকর সে দুটি ঘটনার পশ্চাতে আছে নারীর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ কারণ!

এক. রীমা হত্যাকাণ্ডে ফাঁসির রজ্জুতে সেই মনির

বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত এরচেয়ে বেশি আলোচনা হয়নি কোনো মৃত্যুকাহিনী ও মৃত্যুদণ্ড নিয়ে। ১৯৮৯ সালের ৯ এপ্রিল স্ত্রী শারমিন রীমাকে হত্যা করেন মনির হোসেন। ঘটনার পরদিন তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৯০ সালের ২১ মে ঢাকার জেলা ও দায়রা আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি এই মামলায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। বিচারিক আদালতে দণ্ডিত হোসনে আরা বেগম খুকু পরে হাইকোর্ট থেকে খালাস পেলেও মনিরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অনুমোদন দেন উচ্চ আদালত। এরপর দীর্ঘদিন মামলা চলার পরে নিম্ন আদালতে অপরাধী মুনির হোসেন এবং হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনাদানকারী তার প্রেমিকা হোসনে আরা খুকু দুজনেরই ফাঁসির

রায় হলেও উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগের রায়ে খুকুকে খালাস দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালের ২০ জুন আপিল বিভাগ ওই দণ্ড বহাল রাখে।

নিহত রীমা ছিলেন মরহুম সাংবাদিক নিজামউদ্দিন আহমেদের (১৯৭১-এ ইত্তেফাকে কর্মরত) মেয়ে। অন্যদিকে খ্যাতনামা ডাক্তার বাবা-মায়ের ব্যবসায়ী ছেলে ছিলেন মনির হোসেন।

১৯৮৯ সালে বিয়ের মাত্র তিন মাস পর ৯ এপ্রিল পুলিশ নরসিংদীর কাছাকাছি মিজমিজি গ্রাম থেকে উদ্ধার করে রীমার লাশ। স্বামীর সঙ্গে চট্টগ্রাম বেড়াতে গিয়ে খুন হন শারমিন রিমা। ৭ এপ্রিল ঢাকা থেকে রওনা হয়ে যাওয়ার দুদিন পরে ফেরার পথে স্বামী মনির হোসেন তাকে হত্যা করে মিজমিজি গ্রামের কাছে ফেলে রেখে আসে। বাড়ি থেকে এত দূরে কোনো মেয়ের লাশ পাওয়া গেলে যে কেউই সবার আগে ধরে নেয় স্বামী নিজেও খুন হয়েছে বা নিজেই খুন করেছে। পুলিশও শুরু করে মনিরের খোঁজ। তাকে এক হোটেলে পাওয়া যায়, সেখানে সে পাগল পাগল অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল। খুব সহসাই পুলিশ বুঝতে পারে, আসলে সে পাগলামির অভিনয় করছে পুলিশকে ধোঁকা দিতে এবং আত্মহত্যারও তার আদৌ কোনো পরিকল্পনা ছিল না। একটু খোঁজখবর নিয়েই পুলিশ পুরো ঘটনা বের করে ফেলে। পুলিশ বুঝতে পারে, স্বামীর নির্মম হাতে নিহত হয়েছেন হতভাগ্য রিমা।

মনির ছিলেন শিক্ষিত ধনী বাবা-মায়ের বখে যাওয়া সন্তান। তার চেয়ে অনেক বেশি বয়সের মেয়েদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হতো। বিয়ের আগেই এরকম বেশ ক'টি সম্পর্কে জড়ান। এর মধ্যেই মনিরের সঙ্গে সম্পর্ক হয় নিজের চেয়ে ১৫-১৬ বছরের বড়, কয়েক বাচ্চার মা চল্লিশোর্ধ হোসনে আরা খুকুর সঙ্গে। খুকুর স্বামী ছিল সম্পূর্ণ পঙ্গু। সংসার চালানোর জন্য স্বল্পশিক্ষিত খুকুর একটাই উপায় ছিল, সে ছিল পেশাদার কলগার্ল। সমাজের উচ্চপর্যায়ে ছিল তার ব্যবসাক্ষেত্র। বয়সে অন্তত ১৫ বছরের ছোট মনির গভীর প্রেমে পড়ে এই খুকুর।

বিয়ের পরও মনির পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ রীমাকে কোনো দিনই মন থেকে মেনে নেননি। বরং তিনি সম্পর্ক রেখেছেন কলগার্ল খুকুর সঙ্গে। ফলে খুকু-মুনীরের এ অবাধ সম্পর্কের মধ্যে রীমাকে উটকো ঝামেলা হিসেবে বিবেচনা করে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। তবে ঘটনার অনুকারণ হলেও মূল ঘটনা তথা খুনের ধারে-কাছেও খুকু যায়নি। ফলে একজন কলগার্লের হিংস্রতা ও উদগ্র কামনার আগুনে পুড়ে যায় একটি পবিত্র সম্পর্কের বসতভিটা। নিজহাতে স্ত্রীকে খুন করতে প্রলুব্ধ হন মনির। খুন করেন নিজহাতে, নববধূকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে!

এ ঘটনাটা সে সময় ব্যাপক আলোড়ন তোলে। সব পত্রিকায় বড় বড় স্টোরি ছাপা হয়। একে বলা হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত খুনের মামলা।

দুই. সালেহা হত্যাকারী ডা. ইকবাল :

মনির কর্তৃক রীমা হত্যাকাণ্ডেরও আগে বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকটি আলোচিত ফাঁসির ঘটনা ছিল ডা. ইকবালের ফাঁসি। যৌতুকলোভী ডা. ইকবাল তার নিজের বাড়ির গৃহপরিচারিকার সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়লে সংসারে নেমে আসে অশান্তি। একসময় স্ত্রী জেনে যায় প্রিয়তম স্বামীর এসব বাজে কীর্তিকলাপ। এরপর স্ত্রী এসবের প্রতিবাদ করলে ফুঁসে ওঠেন ডা. ইকবাল। শুরু হয় স্ত্রীর ওপর নির্যাতন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল স্বামীর হাতে নিহত হন সালেহা।

যৌতুকের নির্মমতার ইতিহাসে সালেহা ও তার স্বামী ডা. ইকবালের নাম মনে পড়লে আজও মানুষের অনুভূতি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সালেহার ধনাঢ্য বাবা ভেবেছিলেন বিত্তের জোরেই মেয়েকে ভালো একটা পাত্রের হাতে তুলে দেবেন। আর সেই লক্ষ্যেই মেয়েকে সুখী করার 'সঠিক উপায়' হিসেবে শিক্ষিত জামাই খুঁজতে শুরু করলেন। পেয়েও গেলেন। মেয়ের সুখের গ্যারান্টির জন্য সালেহার বাবা নিজের টাকায় ইকবালকে ডাক্তারি পাস করান। শ্বশুর কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ মেয়ের কল্যাণের জামিন হয়ে তার দুপায়ে সুখ ভরিয়ে দেবে বলে সালেহার বিত্তবান বাবা জামাইয়ের পেছনে অকাতরে অর্থ ঢালতে থাকেন। তাকে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আর দশটি বদনামের সঙ্গে সঙ্গে অকৃতজ্ঞতার বদগুণে বিশেষভাবে ধিকৃত। ফলে শ্বশুরের অর্থপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা

প্রভাবিত করতে পারেনি মাটির গুণকে। তাই পরের ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

অনৈতিক কাজের বিরোধিতা করেছিলেন সালেহা। প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামীর লাম্পট্যের বিরুদ্ধে। সে জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিলো তাকে। এ ঘটনায় দেশের মানুষ নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশে সোচ্চার হয়েছিল। যার সুফল হিসেবে **১৯৮০** সালে যৌতুকবিরোধী আইন প্রণীত হয়। **১৯৮৭** সালে গৃহপরিচারিকার সঙ্গে পরকীয়ার জের ধরে স্ত্রী সালেহাকে হত্যার দায়ে ডা. ইকবালের ফাঁসির ঘটনা ছিল আলোচিত। ডা. ইকবালের ফাঁসি হয়েছিল। তারপর ওই রকম করে আর সামাজিক সোচ্চারের ঘটনা খুব একটা দেখা যায়নি। এখনো অনেক পরিবারেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। অনেককেই হতে হচ্ছে প্রতিবাদের বলি। কিন্তু ইসলামী আদর্শ, নারীসত্তার প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন ও প্রদানে ব্যর্থ হওয়া, শরীয়ত নিষিদ্ধ যৌতুকের ভয়াবহ বিস্ফোরণ নারীকে প্রতিনিয়ত করছে নিপীড়িত, নিগৃহিত এবং নির্যাতিত। নারীকে এই গ্লানিকর জীবন থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই ইসলামের দেখানো সুন্দর ও সরলপথে ফিরে আসতে হবে। পারবে নারীরা?

জীবন ও গল্প

গল্প এক. কলিমুদ্দিন সাহেব তার জীবনের বড় একটা আশা পূরণ করতে গিয়ে অক্লান্ত সাধনা করেছেন। ছেলের ঘরের নাতনীর বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে প্রায় এক বছর আগ থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ওই সময়ে একটা খাসির বাচ্চা কিনে রেখেছেন। একমাত্র ছেলেটা মারা যাওয়ার পর নাতী-নাতনীর দেখাশোনা ও লালনপালনের দায় দরিদ্র কলিমুদ্দিন সাহেবের ওপরই বর্তেছে। পিতৃাধিক মমতা দিয়ে তিনি নাতী-নাতনীদ্বয়কে মানুষ করে তুলছেন। নাতীটা ছোটো, পড়াশোনার মাঝপথে আছে। আর নাতনীটাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠাচ্ছেন। বার্ধক্যের অক্ষমতা আর দারিদ্রক্লিষ্টতা সত্ত্বেও কলিমুদ্দিন সাহেব নাতনীর বিয়েটা বিশেষ আয়োজন করেই সম্পন্ন করতে চান। এই চিন্তা থেকেই তিনি অনেকদিনের জমানো সামান্য কিছু টাকা দিয়ে খাসির বাচ্চাটা কিনেছেন। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে তিনি নাতী কাফিলুদ্দিনকে কয়েকদিনের জন্য স্কুলের লজিং বাড়ি থেকে ছুটিতে ডেকে আনিয়েছেন।

পরের দিন বিয়ে। কাফিলুদ্দিন তার কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত করেছে বিয়ের আয়োজনে সহযোগিতার জন্য। ফজরের আযানের আগেই খাসিটা যবেহ করে গোস্ত কাটাকাটি করার সুবিধার্থে রাতেই বন্ধুরা জমায়েত হয়েছে তাদের বাড়িতে। রাত তখন তিনটার মতো হবে। কাফিলুদ্দিন ঘরের পেছনে কয়েকজন লোকের ফিসফিস শব্দ শুনতে পেলো। ঘুমের আড়ষ্টতা কাটিয়ে দেখলো সত্যিই কয়েকজন

লোক যে ঘরে খাসিটা বেঁধে রাখা হয়েছে সেই ঘরের পেছনে জড়ো হয়েছে। সে দৌড়ে গেল লোকগুলোকে ধরতে। কাছে গিয়ে দেখল ওরা খাসিটা ঘর থেকে বের করে ওদের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছে। নিজের বড় বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানটা তবে মাটি হয়ে যাবে? অসমর্থ দাদার মাথাটা লজ্জায় কাটা যাবে? সে আর ভাবতে পারে না। তাই একাই এতগুলো লোককে রুখে দাঁড়ায় এবং খাসিটার দড়ি টেনে ধরে সে। লোকগুলোর মধ্য থেকে গোঁয়ার কিসিমের একজন এগিয়ে এসে বলে, তুই জানিস না, আমাদের ময়েন ভাই মুক্তিযোদ্ধার সনদ পেয়েছে, তার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে? সেই সংবর্ধনা অুনষ্ঠানের জন্য তোদের খাসিটা নিয়ে যাচ্ছি, মহৎ কাজে বাধা দিসনে, ভালো হবে না বলে দিলাম!

কাফিলুদ্দিন বলে, একজন মুক্তিযোদ্ধার সংবর্ধনার জন্য আমার গরীব দাদার খাসিটা নিতে হবে! তোমরা জানো না আগামীকাল আমার বোনের বিয়ে এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য খাসিটা একবছর ধরে পালা হচ্ছে? লোকটা জবাবে বলে, একজন মুক্তিযোদ্ধার সংবর্ধনার মতো মহৎ কাজের চেয়ে তোর বোনের বিয়ের আনন্দ বড় হলো! তোরাই দেশের কলঙ্ক, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিতে জানিস নে!

কিন্তু দরিদ্র কাফিলদের মুক্তিযোদ্ধাদের এই তরিকায় সম্মান জানানোর মতো সামর্থ্য ছিল না। তাই সে আরো শক্ত করে খাসির রশিটা টেনে ধরল এবং একাই লোকগুলোকে বাধা দিতে লাগল। দলের মধ্য থেকে এগিয়ে এলো ষণ্ডামার্কা এক যুবক। সে বলল,

যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাতে পারে না তাদের বাঁচার অধিকার নেই। একথা বলে ধারালো একটা ছোরা কাফিলুদ্দিনের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে খাসিটা টেনে নিয়ে যেতে লাগল সে।

ধারালো ছোরার আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। একটা গগনবিদারী শব্দ করে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ল কাফিলুদ্দিন। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভয়ানক শব্দে জেগে উঠল পুরো পাড়া। বৃদ্ধ কলিমুদ্দিন দৌড়ে এলেন ঘটনাস্থলে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা নাতীকে দেখে তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তপ্রবাহ ও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো কাফিলুদ্দিনের। নাতীর নিথর দেহের ওপর লুটিয়ে পড়লেন বৃদ্ধ কলিমুদ্দিনও।

পরের দিন ওই বাড়িতে বিয়ের পালকি এলো না। বাড়ি থেকে বের হলো একে একে দুটি জানাযার খাট। কলিমুদ্দিন এলাকার খুবই ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এমন একটি মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ শুনে গোটা এলাকার লোকজন জড়ো হলো জানাযা সালাতে। সালাত শুরুর প্রাক্কালে কলিমুদ্দিন সাহেবের একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাফর সাহেব কান্নাজড়িতকণ্ঠে কিছু কথা বলতে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, শোকার্ত ভাইয়েরা! আপনারা সবাই আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু কলিমুদ্দিন সাহেবকে ভালো মানুষ হিসেবে জানেন। আজ আমি আপনাদের সামনে তার আরেকটি পরিচয় উন্মোচন করতে চাই। এ কথা বলে তিনি একটা পুরাতন কাগজে মোড়ানো জীর্ণশীর্ণ কিছু দলিল-দস্তাবেজ বের করলেন। সবার সামনে রেখে বললেন,

আমাদের প্রিয় কলিমুদ্দিন মরহুম শুধু ভালো মানুষই ছিলেন না; ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাও।

প্রবীণরা জানেন, একাত্তরের যুদ্ধের ৯ মাস বাড়িতে ছিলেন না। আপনাদের মনে কখনও প্রশ্ন জাগেনি যে, তিনি ওই সময় কোথায় ছিলেন, কী করেছেন? এই দেখুন, ইতিহাসের একটা মূল্যবান দলিল। এই কাগজেই লেখা আছে তিনি ওই সময়টাতে কী করেছেন? কোন সেক্টর কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ করেছেন? এবং যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তাকে দেওয়া বিশেষ প্রশংসাপত্র এখানে বিদ্যমান। এরপর তিনি হলদে খামের একটি চিঠি বের করে উপস্থিত শোকার্ত মানুষকে পাঠ করে শোনালেন। চিঠিটি রাষ্ট্রপক্ষ থেকে কলিমুদ্দিনের নামে পাঠানো। এতে একাত্তরের বিশেষ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে এবং অতিসত্বর তাকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

জাফর সাহেব শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, আপনারা জানেন, চিঠিটি পেয়ে তিনি কী করলেন? আমাকে ডেকে বললেন, জাফর! যে ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে সেই ঠিকানা বরাবর তুমি একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দাও যে, কলিমুদ্দিন নামের লোকটা বেশ কিছুদিন আগেই মারা গেছেন! আমি তার কথায় খুবই অপ্রস্তুত এবং অবাক হয়ে গেলাম। কেননা তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। আজ এত বড় একটা সত্য কথা চেপে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন কেন? তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝলেন এবং প্রশ্ন

করার আগেই জবাব দিতে গিয়ে বললেন, জাফর! আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ করেছি দেশের জন্য, দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এটাকে আমি দেশ ও মানুষের সেবার নিয়তেই করেছি। তুমিই বলো, দেশ ও মানুষের সেবা করে বিনিময় নেয়া যায়? আমি সেদিন আর কথা বাড়াইনি, তার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের সামনে কথা বাড়ানোর মতো সাহসও আমার ছিল না। তাই আদেশ মোতাবেক আমি একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দিই যে, কলিমুদ্দিন নামের সেই মুক্তিযোদ্ধা....

বন্ধুগণ! মরহুম কলিমুদ্দিনের জীবনের বিরাট একটা অংশ আপনাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল বলে আজ প্রকাশ করে দিলাম। এই শোকের মুহূর্তে বড্ড অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, আজ ময়েন নামের যে ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধার সনদ লাভ উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার আয়োজন করতে গিয়ে কলিমুদ্দিন ও তার নাতী প্রাণ হারালেন, এলাকার প্রবীণ লোকেরা বলে থাকেন, সেই লোকটার জন্ম হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধেরও কয়েক মাস পরে!

গল্প দুই. ভিক্ষাবৃত্তিই আমার মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার!

বীর মুক্তিযোদ্ধা সফর আলী একাত্তরের টগবগে তরুণ, দেশমাতৃকার মুক্তির আশায় সেদিন জীবনবাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মরণপণ সংগ্রামে। মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে তাকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে আজ হাত পাততে হয় অপরের করুণার প্রত্যাশায়। নিজেকে প্রশ্ন করেন এই কি বিজয়, এই কি স্বাধীনতা? ভিক্ষাবৃত্তিই আমার মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার!

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার মনরাজ গ্রামের টগবগে যুবক সফর আলী ৬৯'র আন্দোলনমুখর দিনে তৎকালীন মুজাহিদ বাহিনীর চাকরি ছেড়ে নেমে আসেন রাজপথে। ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে যুদ্ধের প্রস্তুতিগ্রহণ করেন। কুলাউড়ার প্রয়াত সংসদ সদস্য আব্দুল জব্বার, জুড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল মুমিত আসুকের সঙ্গে ৪নং সেক্টর কমান্ডার মেজর সি.আর দত্তের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণ করেন।

যুদ্ধে যাবার সময় মা, স্ত্রী, কন্যাসহ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময়টুকু পাননি। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অনেক সাথীকে হারিয়ে মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করেছেন। দেশ ও জাতির বিজয় অর্জিত হয়েছে।

বিজয়ের ৪৩ বছর পর তার অনুভূতি জানতে চাইলে কান্না বিজড়িতকণ্ঠে মুক্তিযোদ্ধা সফর আলী বলেন, দেশ স্বাধীনের পরপরই সব নেতার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি একটি কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য। তার ভাগ্যে কোনো কাজ জোটেনি। শরীরের শক্তি থাকায় দেশ স্বাধীনের পর তিনি রিকশা চালিয়ে পরিবারের সদস্যদের অন্নের সংস্থান করতেন। অসুস্থ মা চিকিৎসার অভাব সঙ্গে নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আর শরীরে শক্তি নেই, স্ত্রী, কন্যা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রায়ই অর্ধাহারে থাকতে হয়।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হয়। এই ভাতার টাকায় সংসার চলে না, জীবনের শেষ বয়সে অসুস্থ এই

বীর মুক্তিযোদ্ধার ডান হাতটি নষ্ট হওয়ার উপক্রম। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাকে দেখা হয় অবহেলিত চোখে।

তাছাড়া তার নিজের কোনো বাড়ি-ভিটে নেই। শ্বশুর বাড়ির একখণ্ড জমিতে যাযাবরের মতো তাকে দিনাতিপাত করতে হয়। প্রতিনিয়ত মানুষের করুণার পাত্র হয়ে তাকে হাত পাততে হয়। মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় সম্মানে সমাহিত করার চেয়ে তার কাছে এ মুহূর্তে নিয়মিত দু'মুঠো অন্ন বড় জরুরি।

সফর আলী বলেন, বিজয়ের ৪৩তম বছর চলছে অথচ আমার মাথা গোঁজার একটু স্থান নেই! এখন চাওয়া শুধু নিয়মিত দুই মুঠো ভাত খেয়ে জীবনের শেষ সময়ে মানুষের কাছে হাত না পেতে একটু শান্তিতে মৃত্যু। [সূত্র : শীর্ষ নিউজ]

হ্যাঁ, গল্পের কাহিনীর মতোই কৃত্রিম মুক্তিযোদ্ধারা দলীয় বিবেচনায়, আত্মীয়তার জোরে মুক্তিযুদ্ধের সময় মায়ের কোলে বাস করে, কেউ বা উদরে বাস করে কেবল মায়ের বমির উদ্রেকের কারণ সৃষ্টি করে এবং কেউবা তারও পরে স্বাধীন দেশে নাড়ি কেটে আজ মুক্তিযোদ্ধা সনদ পেয়ে নিয়মিত ভাতা, বোনাস ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করে চলেছে। পক্ষান্তরে বহু মুক্তিযোদ্ধা, প্রকৃতই যারা জীবনবাজি রেখেছিলেন তারা উপেক্ষিত। অনেকদিন আগে এক মুক্তিযোদ্ধার কষ্টের জীবন দেখে চোখ বেয়ে পানি নেমে আসার অবস্থা হয়েছিল। একটি দুই চাকার গাড়ির সঙ্গে দুটি কুকুর জুড়ে দিয়ে তিনি মানুষের

মালামাল টেনে কোনোমতে জীবনযুদ্ধে টিকে আছেন বলে খবর বের হয়েছিল।

বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের মতো সার্বজনীন স্বীকৃত বিষয় নিয়েও রাজনীতি করা হয়। এত বড় একটি গৌরবদীপ্ত ইতিহাসকেও নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে হরদম ব্যবহার করা হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সর্বজন স্বীকৃত কোনো ইতিহাস রচিত হয়নি। কাউকে তো সংবিধান রচনা করে তার অবদান খাটো করা হচ্ছে। এভাবে অবিকৃত ইতিহাসের কারণে কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছেন কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত। কাউকে পাততে হচ্ছে ভিক্ষার হাত।

আর সবচেয়ে করুণ আর কষ্টের কথা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক নারী ইজ্জত হারিয়েছিলেন। অনেক নারী ইজ্জতের প্রশ্নে আপোস না করে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হন নারীদের ইজ্জত হরণ করা হলে এবং একটা জাতির পতনের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় নারীদের ইজ্জত প্রদানে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে। পাকিস্তানীদের সেদিনের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নারীদের ইজ্জতহরণ এবং এদেশের মুসলিম নারীদের ইজ্জত হারানো। বড় পরিতাপের বিষয় হচ্ছে; যে নারীদের ইজ্জতহরণের বদৌলতে বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল আজ নারীদের সেই ইজ্জতই পানির দরে বিক্রি হচ্ছে! মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যদি শহীদ আর গাজীই মনে করো তবে তাদের রেখে যাওয়া নারীদের ইজ্জতের আমানত রক্ষা করছো না কেন?

আসলে আজ মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বার্থবাজদের স্বার্থপূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই হাতিয়ার কখনও কলমে পরিণত করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ইতিহাস রচনা করা হচ্ছে, কখনও নষ্ট-ভ্রষ্ট আল্লাহদ্রোহী যৌনমেলাকে প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ভয়ানকভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা নস্যাৎ করা হচ্ছে। একটা জাতির জন্য এরচেয়ে বড় অবমাননা আর কী হতে পারে যে, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, সন্তান এবং নাতনি পর্যন্ত তথা স্ত্রী থেকে শুরু করে বংশের গোটা ধারা নিজেদের লজ্জাস্থান বিক্রি করে রুটিরোজগারের ব্যবস্থা করছে? নারী অবমাননা ও অবমূল্যায়নের এরচেয়ে বড় কোনো দৃষ্টান্ত থাকলে আমাকে জানাবেন, প্লিজ!

সত্যিকারার্থে ইসলামের চর্চা যদি এ দেশে করা হত, তাহলে এমন অকৃতজ্ঞতা ও নারীর এমন অবমাননার ঘটনা কখনো ঘটত না। মহান আল্লাহ নারীর সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার্থেই পর্দা বিধান ফরয করেছেন নারী ও পুরুষের ওপর এবং নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়েছেন একান্তই পুরুষের ওপর। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন,

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ

أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١ ﴾ [النور: ٣٠، ٣١]

'মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৪}

আরেক সূরায় আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰۖ ﴾ [الاحزاب: ٣٣]

‘আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক- জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।’ {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৩৩}

নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ঘোষণা করেন,

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ ﴾ [النساء: ٣٤]

‘পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেন।’ {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৪}

নারীর আর্থিক দায়িত্ব সর্বদাই পুরুষের ওপর। বিয়ের আগে পিতা, তার অবর্তমানে বড় ভাই, বিয়ের পর স্বামী, স্বামীর অবর্তমানে ছেলের ওপর। এর কোনোটাই না থাকলে রাষ্ট্রকে তার আর্থিক চাহিদা মেটাতে হবে।

তেমনি নারীর সম্ভ্রম ও সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যিনা-ব্যভিচারকে ইসলাম মারাত্মক অপরাধ বিবেচনা করা হয় এবং এর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢ ﴾ [الاسراء: ٣٢]

‘আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।’ {সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩২}

এর শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٖۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةٗ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ٤ ﴾ [النور: ٢، ٤]

‘ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ’টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক।’ [সূরা আন-নূর, আয়াত : ২-৪}

অবাধ পেশা ও একজন ফেরারী নারী সাংবাদিকের গল্প

নারীদের পেশার অবারিত ও অপ্রতিরোধ্য বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি করেছে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। বহিঃবিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও চলছে সব পেশায় নারীকে প্রতিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত করার অদম্য প্রতিযোগিতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহায়ত্ব ও আর্থিক দুর্বলতার সুবাধে পেশায় যুক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা পেশায় আসছে অপ্রয়োজনে এবং 'পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেই উপার্জন করতে হবে' এই মানসিকতা নিয়ে। এই মানসিকতা নারীর ভ্যানিটি ব্যাগে কিছু অর্থের সংস্থান করলেও তারা যে কী সম্পদ হারিয়েছে তা একবারও ভেবে দেখার দরকার মনে করে নি।

দরকার মনে করবেই বা কেন? অর্থলোভী মুনাফাখোররা নারীদের মনে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম ও সফল হয়েছে যে, সতীত্বে নারীত্ব নয়; নারীত্ব ও নারীর মর্যাদা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেয়ায়, তাদের কাঁধে কাঁধ রেখে চলায়। এই খ্যাপাটে ভাবনা ও মানসিকতা বাংলাদেশে সবচেয়ে বিস্তৃত হয়েছে মিডিয়া অঙ্গনে। মিডিয়া জগতে নারীর অবাধ বিচরণ দেখলে সন্দেহ লাগে; এগুলো দ্বিতীয় গার্মেন্টস সেক্টর কিনা! এই অঙ্গনে নারীদের আসাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খোদ নারীরাই। ইসলামী সমাবেশে এক নারী সাংবাদিককে তৌহিদি জনতার কেউ কেউ শালীন পোশাকে এবং পুরুষদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর তাতেই ক্ষেপে গিয়েছিলেন এদেশের নারীবাদীরা!

‘নারীদের মানসম্মান ও অধিকার গেলো রে’ বলে হইচই জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সতর্ককরণ যে মানবিক দিক বিবেচনায়, তা এই নারীবাদীরা মানতে নারাজ। তারা নারীদেরকে উস্কে দিতে পারে বটে, কিন্তু পারে কি সতীত্ব-সম্ভ্রমহারা নারীর সতীত্ব ফিরিয়ে দিতে? একজন নারীর জন্য অর্থোপার্জন করা বৈধ বটে কিন্তু তাই বলে তাদের জন্য সব ধরনের পেশা যে নিরাপদ নয়, তা বুঝিয়ে দিলেন এক নারী সাংবাদিক তার নারীত্বের দাম চুকিয়ে।

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে আটক করা হয় ঢাকার এক তরুণী ফ্রিল্যান্স সাংবাদিককে। ঘটনার উৎস সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি নিজে দাবি করেছেন, ভারতের রাজস্থানের জয়পুরে বিক্রি করা হয়েছিল তাকে। সেখানে একটি ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়। তবে এক সহৃদয় যুবকের সহায়তায় তিনি পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গিয়েছেন। পুলিশ বলছে, সন্দেহ হওয়ায় তারা তাকে সোমবার বালুরঘাট স্টেশন থেকে আটক করে। তার কাছে বাংলাদেশের কোন পাসপোর্ট বা ভিসা পাওয়া যায় নি। ফলে তাকে মালদহের একটি হোমে রাখা হয়। তরুণীটি জানিয়েছেন, তার নাম বর্ষা চৌধুরী। ঢাকার হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের বাণিজ্য বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কিছুদিন একটি অপরাধ বিষয়ক পত্রিকায় কাজ করেছেন। পরে তিনি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা করছিলেন।

বর্ষা (১৭) পুলিশকে জানিয়েছেন, ১৫ দিন আগে ঢাকা থেকে চার বান্ধবী এবং তিন বন্ধু মিলে যশোরে বেড়াতে গিয়েছিলেন তারা। সেখান থেকেই ইছামতি নদীতে নৌবিহারে বের হওয়ার প্রস্তাব করে

সুজন ও মনির। একপর্যায়ে তারা ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে যাওয়ার পর বন্ধু সুজন প্রস্তাব দেয় ভারতের গুজরাটের আমেদাবাদে তার আপন মামা থাকেন। সেখানেই তারা যাবেন। এই প্রস্তাবে বর্ষা প্রথমে আপত্তি করলেও পরিস্থিতি অনুকূলে নয় বুঝতে পেরে রাজি হয়ে যান। হাওড়া হয়ে বর্ষাদের নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে আমেদাবাদে। সেখান থেকে রাজস্থানের জয়পুরের একটি হোটেলে। সেখানে ২০ হাজার রুপিতে তাকে বিক্রি করে দিয়ে সুজন-মনির চম্পট দেয়। বর্ষাকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। সেখানে তিনি যা হারানোর সবই হারান। হারান জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সতীত্ব।

সব হারানোর পর হোটেলের বাঙালি এক কেয়ারটেকারের সাহায্যে পালিয়ে হাওড়া হয়ে হাওড়া-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেসে করে দক্ষিণ দিনাজপুর হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পথেই বর্ষা বাংলাদেশী বলে কোনো একজন যাত্রীর সন্দেহ হয়। ওই যাত্রী স্থানীয় পুলিশকে খবর দেন। বালুরঘাট স্টেশনে নামলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে বর্ষাকে। বালুরঘাট থানা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে বর্ষার সঙ্গে আরও তিন বন্ধুর নাম ও পরিচয় উদ্ধার করা হয়। বর্ষার সঙ্গে আসা আরও তিন তরুণীর খোঁজে পুলিশ গুজরাট ও রাজস্থান যাওয়ার পরিকল্পনা করে।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডিএসপি উত্তম ঘোষ জানান, বাংলাদেশী ওই তরুণীকে মালদার একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনা শুনে সত্যিই অবাক হয়েছি আমরা।

গত এক বছরে এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষিতা মেয়ে নানাভাবে প্রতারিত হয়ে ভারতে পাচার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্তারা। আরও জানা গেছে, ঢাকার রায়েরবাগের বাসিন্দা বর্ষা চৌধুরী। তিনি অপরাধ বিষয়ক পত্রিকা 'সরেজমিন'-এ কাজ করেছেন কয়েক মাস। সম্প্রতি সে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। সর্বশেষ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছিলেন।

উত্তম ঘোষণার কথাটা আমাদের ভাবা দরকার। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, মাত্র কিছুদিনের মধ্যে অনেক শিক্ষিত মেয়েকে ভারতে পাচার করা হয়েছে। তিনি তো শুধু ধরা পড়া মেয়েদের তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু যারা ধরা পড়েন নি, যাদেরকে চাকরি দেয়ার কথা বলে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সুদূর সীমানায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তাদের খবর কি কেউ রেখেছে? এভাবে নারীরা পেশা গ্রহণ করতে গিয়ে দুঃসাহসী হয়ে উঠছে এবং বিশ্বের যে কোনো প্রান্তরে কাজ করাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে।

তারা একথা বোঝার চেষ্টা করেনি যে, তাদেরকে এক হাতে পেশায় আহ্বান করা হলেও অপর হাত দিয়ে ইশারা করা হয়েছে ভোগের খামারে নাম লেখাতে। আজ পেশাদারিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে কত নারীকে যে কতভাবে ভোগের শিকার হতে হচ্ছে তার ইয়াত্তা নেই। একবার পেশার খাতায় নাম লেখার পর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি নারীত্বের স্বকীয় মর্যাদায়। এভাবে প্রতিনিয়ত মুখ বুজে সহ্য করতে হয় নিজের নারীত্বের অবমাননা। সতীত্ব যাবে, মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে কিন্তু

তবু রক্ষা করতে হবে পেশার সম্মান। নিজের সম্মান ডুবানো যাবে, কিন্তু পেশার অসম্মান করা যাবে না!

বিয়ে ভাঙার সিঁড়ি ভাঙা হচ্ছে ঝড়ো বেগে!

২০১০ সালের ১৪ অক্টোবর একজন প্রবাসীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শামসুন্নাহারের (ছদ্মনাম)। বিয়ের কিছুদিন পর স্বামী চলে যান মধ্যপ্রাচ্যে তার কর্মস্থলে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কোলজুড়ে সন্তান আসে শামসুন্নাহারের। কন্যাসন্তান। দীর্ঘ বিরতিতে একবার দেশে আসেন স্বামী কফিল (ছদ্মনাম)। কিন্তু এত দিন পর দেশে এলেও স্ত্রী-সন্তানের প্রতি কোনো টান যেন নেই। অন্য এক নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে ধারণা শামসুন্নাহারের। এমনকি তার মানিব্যাগেও এক দিন দেখতে পান সেই নারীর ছবি। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় কলহ। একপর্যায়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন শামসুন্নাহার। কিন্তু স্বামীর মতিগতির পরিবর্তন নেই। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন শামসুন্নাহার।

এর ঠিক উল্টো ঘটনাও আছে। সৌদি আরবের রিয়াদে থাকেন মাহমুদুল আলম (ছদ্মনাম)। ২০০৭ সালে দেশে ফিরে বিয়ে করেন শামীমাকে (ছদ্মনাম)। বিয়ের পর কর্মস্থলে ফিরে যান মাহমুদ। মাঝেমধ্যে দেশে আসেন। ২০১১ সালে দেশে ফিরে স্ত্রীর চালচলনে কেমন একটা পরিবর্তন দেখতে পান। লুকিয়ে মুঠোফোনে কার সঙ্গে

যেন কথা বলেন শামীমা। এক দিন মুঠোফোনে সেই ব্যক্তির খুদে বার্তা এলে মাহমুদের সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহের একপর্যায়ে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সমঝোতা হয়। শামীমা সব দোষ স্বীকার করে ভবিষ্যতে আর এ রকম ঘটবে না বলে কথা দেন।

কিন্তু সমঝোতার মাত্র কয়েক দিন পর ২০১১ সালের ৩১ অক্টোবর নিখোঁজ হয়ে যান শামীমা। বাকলিয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন স্বামী। স্থানীয় তিনটি দৈনিক পত্রিকায় ছাপানো হয় নিখোঁজ সংবাদ। কিন্তু খোঁজ মেলে না শামীমার। স্বামী মাহমুদের ধারণা, প্রেমিকের আশ্রয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে তার স্ত্রী। অবশেষে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্ত্রীকে তালাকের নোটিশ দেন মাহমুদ।

প্রবাসী আর স্ত্রীর দ্বন্দ্ব-লড়াইয়ে শুধু সংসার ভাঙছে তাই নয়; প্রাণহানী ঘটছে সমানতালে। এগুলোর কোনো কোনো ঘটনা এত মর্মান্তিক যা হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ঘটায়। এমনি এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী ইউনা হত্যাকাণ্ড।

অন্যের সঙ্গে ফোনে কথা বলা নিয়ে বিরোধের জের ধরে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে সোহেল আহমদ হত্যা করে এই লন্ডনি কন্যা ইউনাকে। ঘটনার তিন মাস পর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ইউনার প্রেমিক বন্ধু সোহেল পুলিশকে এ তথ্য জানিয়েছেন। ৪ অক্টোবর ২০১৩ ইং তারিখে মৌলভীবাজার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন আসামি সোহেল আহমদ।

পুলিশকে আরও জানিয়েছেন বিবাহিত ইউনাকে তিনি ভালবাসতেন। ইউনাও তাকে খুব ভালবাসতো। কিন্তু ইউনা চাইতো না সুহেল তার সঙ্গে থাকার সময় অন্য কারও সঙ্গে কথা বলুক ফোনে। কিন্তু এই না চাওয়া হয়েছে তার কাল। মৃত্যু ডেকে এনেছে এই বাসনা।

২৯ জুন ২০১৩ রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের গোমড়া এলাকায় নিজ প্রাইভেট কারে পাওয়া যায় লন্ডন প্রবাসী সেহলিনাত ইলাত ইউনা (২৪) তরুণীর লাশ। লাশের মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন থাকলেও তার মৃত্যুর কারণ ছিল রহস্যাবৃত। জানা গেছে, এ তরুণী নিজেই তার প্রাইভেট কার ড্রাইভ করতেন। ঘটনার পরদিন নিহত তরুণীর ভাই মৌলভীবাজার মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মৌলভীবাজার সদর উপজেলার উত্তর মোলাইম নিবাসী জয়নুর রহমানের কন্যা সেহলিনাত ইলাত ইউনার বিয়ে হয় ২০১০ সালে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার নগর (ঢাকা দক্ষিণ) গ্রামের মৃত কলা মাস্টারের ছেলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী জামিলুর রশিদের সঙ্গে। গত ২৭ মে যুক্তরাজ্যে স্বামীকে রেখে দেশের বাড়ি মৌলভীবাজারে আসেন ইউনা।

জানা গেছে, সে কখনও থাকতো পিতার বাড়ি আবার কখনও নানীর বাসায়। দেশে আসলে প্রায় সময় নিজে তার প্রাইভেট কার নিয়ে বের হতেন। কখনও সঙ্গে থাকতো ড্রাইভার বা বন্ধু। এ তরুণী ঘটনার কয়দিন আগে তার নানীর বাসা শহরের টিবি হাসপাতাল সড়কে উঠেন। ২৯ জুন সন্ধ্যাবেলা প্রাইভেট কার নিয়ে ঘুরতে বের হন। ঘরে ফেরেন লাশ হয়ে। পরে জানা যায় তাকে ঘটনার দিন

রাত অনুমানিক ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে কিছু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়। তারপর আঘাত প্রাপ্ত স্থান একটি ব্যবহার করা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে গাড়ি করে নিয়ে ওই স্থানে ফেলে আসা হয়। তদন্ত সূত্র জানিয়েছে, ইউনার মোবাইলের কল লিস্ট পরীক্ষা করে তখন একটি মোবাইল ফোন নম্বর পাওয়া যায় যে নম্বর থেকে হত্যাকাণ্ডের আগে ইউনার ফোনে কল যায়।

এ ফোনের মালিক সোহেল আহমদ (২৮)-কে আটক করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদে সোহেল পুলিশকে জানায় ইউনার সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় তারা দু'জন মৌলভীবাজার-শ্রীমঙ্গল সড়কস্থ একটি বার্গার হাউসে যায়। সেখানে দু'জন কিছু সময় কাটায়। এক পর্যায়ে সোহেলের ফোন বাজলে ইউনা ফোন ধরতে বারণ করে। এ সময় দু'জনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। দুজন সেখান থেকে বের হয়ে ইউনার গাড়ি করে মৌলভীবাজারের দিকে আসার পথে আবার একই ঘটনা ঘটলে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়।

সোহেল ইউনাকে গাড়ি থামাতে বলে। ইউনা গাড়ি থামালে সোহেল নেমে সড়কে একটি আধা ভাংগা ইট পায়। এ সময় ইউনা সিডি লাগাচ্ছিল গাড়ির ক্যাসেট প্লেয়ারে। এ সুযোগে সোহেল ইট দিয়ে ইউনার মাথার পেছনে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায় ইউনা। একপর্যায়ে তার মৃত্যু হলে সোহেল ঘাবড়ে যায়। পড়ে সে সিট নিচু করে পেছনের সিটে নিয়ে যায় ইউনার নিথর দেহ। গাড়িতে থাকা একটি পুরানো তোয়ালে দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ঢেকে

সিটে শুইয়ে রাখে। গাড়ির পেছনের গ্লাস কালো থাকায় এ সুযোগ কাজে লাগায় সোহেল। পরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চড়ে চলে আসে মৌলভীবাজার শহরে।

সোহেল দাবি করে সে ইউনাকে ভালোবাসতো। তবে ইউনার কথা ছিল তার সঙ্গে থাকার সময় অন্য কোনো ফোন ধরতে পারবে না। তবে সে আরও জানিয়েছে সে ইউনাকে হত্যা করার জন্য ইট দিয়ে আঘাত করেনি। [সূত্র : ইন্টারনেট, শনিবার, ০৫ অক্টোবর ২০১৩]

এভাবেই স্বামী বা স্ত্রীর অন্য কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া নিয়ে সন্দেহ-অবিশ্বাসের জন্ম। তাতে মন ভাঙে, সংসারও ভেঙে যায়। শুধু পরকীয়া নিয়ে সন্দেহ-অবিশ্বাস নয়। ব্যক্তিত্বের সংঘাত, যৌতুকের দাবি, মাদকাসক্তি নির্যাতন বা প্রতারণা ইত্যাদি নানা কারণে ভাঙছে সংসার। সংসার ভাঙার প্রবণতা প্রবাসী প্রাবল্য এলাকাগুলোতে তুলনামূলক বেশি। যেমন, চট্টগ্রামে গড়ে প্রতি তিন ঘণ্টায় ভাঙছে একটি করে সংসার। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সালিশি আদালত থেকে এ তথ্য জানা গেছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সালিশি আদালতের তথ্যানুযায়ী ২০০৯ সালে গড়ে প্রতি পাঁচ ঘণ্টায় একটি করে সংসার ভাঙত।

আদালতে জমা দেওয়া বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনের বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গার্মেন্টসে কর্মরত মেয়েদের বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন সবচেয়ে বেশি। বিয়ের পর স্বামীরা তাদের বেতনের টাকা হাতিয়ে নেয়, মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন, নির্যাতন করেন, অন্য নারীর

সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক রাখেন বা গোপনে অন্যত্র বিয়ে করেন বলেও অভিযোগও করেছেন তারা।

এ ছাড়া প্রবাসে কর্মরত পুরুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন তাদের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে। উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত পরিবারে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, যৌতুক, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে বোঝাপড়ায় সমস্যা ও পরকীয়া প্রেম প্রভৃতি কারণ দেখিয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের দিক থেকে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করা হয়।

মনোরোগ চিকিৎসকদের মতে, নৈতিক স্খলনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা। তাদের মতে, প্রবাসীদের সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে বাড়ছে মূলত সন্দেহ-অবিশ্বাস থেকে। বিদেশে হাড়ভাঙা খাটুনির পর স্ত্রীর সঙ্গ পান না তারা। এমনকি তাদের জীবনে অন্য কোনো বিনোদনও নেই। দেশে স্ত্রী কী করছে এই চিন্তায় অস্থির থাকেন তারা। তার ওপর দেশ থেকে অনেক সময় বাবা-মা বা ভাইয়েরা তার স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে নানা অভিযোগ করেন। এগুলো তার মনকে বিষিয়ে দেয়। স্ত্রীকে ফোন করে তারা তখন কটুকাটব্য করতে থাকেন। এতে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে।

তবে এ কথাও ঠিক, দীর্ঘকাল স্বামীর অনুপস্থিতিতে অনেকে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এটা একটা জৈবিক কারণ। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই জৈবতাড়নাই তাকে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে প্ররোচিত করে। পোশাক-কর্মীদের মতো যারা নিম্নআয়ের

মহিলা, অনেক দরিদ্র পুরুষই তাদের বিয়ে করেন অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য। অনেক সময় স্ত্রীর টাকায় নেশা করেন অনেকে, কেউ বা গোপনে অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে পড়েন। এই মেয়েরা এখন অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী। তারা এ অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করেন না। তাই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর মতো সিদ্ধান্ত নেন।

উচ্চবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী ব্যবসা বা বড় চাকরি করেন। নিয়মিত মদ্য পান করাকে সোশ্যাল স্ট্যাটাসের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করেন। এ ছাড়া এ শ্রেণির মেয়েদের মধ্যেও নানা হতাশা থেকে বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপনের অনেক নজির আছে। সব মিলিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিড় ধরে, যার অনিবার্য ফল বিবাহবিচ্ছেদ।

মাদকাসক্তি, সন্দেহ-অবিশ্বাস এবং অনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও বিয়ে ভাঙার মারাত্মক আরেকটি কারণ সম্পর্কে সমাজবিদগণ চিন্তিত। নানা অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত ঘটনায় জন্ম নিচ্ছে এই দুশ্চিন্তা। বিয়ের পরে অনেক স্ত্রী আবিষ্কার করেন তার স্বামী তাকে আসলে পর্নোগ্রাফি নায়িকার মতন করে চাচ্ছে।

এই নিকৃষ্ট ভাবনায় ভাঙছে অজস্র সংসার। বিয়ের পরে স্ত্রীকে ভোগ করতে চায় পশুর মতো করে। বহু পরিবারের ভাঙ্গনের কারণ এই পর্নোগ্রাফি। বহু সরলা স্ত্রীরা হতভম্ব হয়ে যান স্বামীর সুশ্রী চেহারার নিচে কদর্য দেখে। পাশ্চাত্যের দেখাদেখি পর্নোগ্রাফি আমাদের সমাজেও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ফেসবুকেও অজস্র

পর্নোগ্রাফিক ফটোর ছড়াছড়ি। ছেলে এবং মেয়ে কেউই বাদ যাচ্ছে না এসব ছবি দেখার হাত থেকে। অনেক ছেলেরাই পর্নোগ্রাফি মুভি এবং গল্পসমূহের নেশার শিকার। সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিদগণ বলছেন, পর্নোগ্রাফি কোনো অভ্যাস নয় শুধু, এটা একটা নেশাও। নিউরোসায়েন্টিস্টরা বিষয়টাকে ভয়াবহ নেশা হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। একসময় অভ্যাস হয়ে তা মনের ভিতরে প্রোথিত হয়ে যায়। ক্রমাগত পর্নোমুভি দেখতে দেখতে অনেকেই মানসিকভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিয়ের পরেও ছাড়তে পারে না তারা এই ভয়ঙ্কর নেশা।

সময় থাকতে সাবধান না হলে আরো ধ্বংস ও পতন অনিবার্য। এই নেশা কাটিয়ে উঠতে হবে। কেননা স্বামীর মুখে যত ভালো কথাই প্রকাশ পাক না কেন, সবাই স্বামীকে যতই ভালো মানুষ জানুক না কেন, স্ত্রী ঠিকই বুঝতে পারে সেই পুরুষ মূলত কোন্ পর্যায়ের চরিত্রবান।

আজকাল পর্নোগ্রাফি কত শত-সহস্র পরিবার ধ্বংস করছে সেইটা চিন্তা করলেও আতঙ্কে নীল হয়ে যেতে হয়। সাধারণ শারীরিক চাহিদার পূরণের বিষয়টাকে ঘাঁটাতে ঘাঁটাতে নষ্ট করে কত আক্রমণাত্মক, পাশবিক আর অরুচিকর বিষয়ের উপস্থাপনা করছে ওরা। অনলাইন জগতের সবচাইতে বেশি সংখ্যক সাইট তাদেরই এবং এই ইন্ডাস্ট্রির অর্থ উপার্জনের বিশাল মাত্রার কারণেই তাদের আগ্রহও বেশি। কারণ, মানুষ সহজেই এতে আকৃষ্ট হয়।

বস্তুত ভয়ানক এক নেশার প্রতিকৃতি হচ্ছে এই পর্নোগ্রাফি। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর হলগুলোতে নেটওয়ার্কে হাত বাড়ালেই পর্ণমুভি পাওয়া যায়। অজস্র দোকানে, ফুটপাতে পর্ণের ডিভিডি। উঠতি বয়েসি থেকে মধ্যবয়সী ছেলেরা (এখন মেয়েরা তো বটেই) নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে প্রায় প্রতিদিন মাঝরাতে মনিটরে পর্ণ দেখতে দেখতে। এই নেশায় বিয়ের আগেই তারা খুঁজে নেয় শরীর ভোগের কোনো মানুষ। বিয়ের পরেও স্ত্রীকে ভোগ করতে চায় পশুর মতো। সুখ তিরোহিত হয়। বহু পরিবারের ভাঙ্গনের কারণ এই পর্নোগ্রাফি। বহু সরলা স্ত্রীরা হতভম্ব হয়ে যান স্বামীর সুশ্রী চেহারার নিচে কদর্যতা দেখে। বেশিরভাগ মানুষ এই নেশা ছাড়তে পারে না জীবনের শেষ বয়সেও।

বিবাহ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও পবিত্রতম বন্ধন। এই বন্ধনকে সুদৃঢ়, স্থায়ী এবং মধুময় করে তুলতে শরীয়ত মানুষকে কত রকমের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। অস্থায়ী বিয়ে হারাম করেছে, অশ্লীলতাকে চরমভাবে ঘৃণার বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কে মোহনীয় করতে তাদের মধ্যে হাসি-কৌতুক ও ঠাট্টা-মশকরাকেও ছাওয়াব হাসিলের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শরীয়ত নির্দেশিত এই বিধানাবলি উপেক্ষা করে বিয়ে ভাঙার সিঁড়িগুলো কি না মাড়ালেই নয়! মানুষ সাধারণ কাজে যতটা না স্থবির, বিয়ের সম্পর্ক ভাঙার সিঁড়িতে তারা ততই গতিময়, ঝড়োবেগী!